বাৎসরিক পত্রিকা - '২৩

ক্রেওল

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী'

চাকদহ রামলাল একাডেমী

চাকদহ রামলাল একাডেমী

(উচ্চতর মাধ্যমিক)

চাকদহ, নদীয়া।

W.B.B.S.E. : Index No. D2-026 I W.B.C.H.S.E. : Index No. 112022 I H.S. Centre Code 4302
W.B.S.C.V.E. & T. Code No. : 6281 I DISE Code : 19102500903

স্থাপিত ঃ ১৯০৭

"ক্রেওল"

বার্ষিক পত্রিকা

৫৩তম বর্ষ, ২০২৩

যুগ্ম সম্পাদক ▸▸ সাধন মণ্ডল
নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস

প্রকাশক ▸▸ ড. রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক

মুদ্রণ ▸▸ চাকদহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
চাকদহ, নদীয়া।

প্রকাশনার তারিখ ঃ ০১.০৮.২০২৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		১৫
আমাদের ভারত	অর্ঘ আচার্য	১৭
দোল	রণিত আচার	১৭
চাকরি - বাকরি	সৌরিত সরকার	১৮
আমার প্রিয় মানুষ	অর্ণব দাস	১৮
সাপুড়িয়া	সৌভিক দাস	১৮
বৃষ্টি	সুভম দে	১৯
বর্ষা এল	আখিরুল মণ্ডল	১৯
লক্ ডাউন	অঙ্কুশ বিশ্বাস	২০
টাকা	তির্যাণ মালো	২০
বিচিত্রময় পৃথিবী	পৃথ্বিজীৎ সমাদ্দার	২০
আদর্শ হাইস্কুল	সুদীপ বিশ্বাস	২১
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী	সপ্তপর্ণী সরকার	২১
মা ও ছেলে	সুকৃত মণ্ডল	২২
পুজোয় বিপদ	শিঞ্জন ব্যানার্জ্জী	২২
ভারতবর্ষ	রূপম নন্দী	২৩
শপথ	সায়ন সরকার	২৩
হারিয়ে গেছি আমি	চন্দ্রিমা মুখোপাধ্যায়	২৩
অবোধ পোলাপান	অংশুমান বিশ্বাস	২৪
মনপাখি	দীপ্তপর্ণী লাহিড়ী	২৪
বন্ধু রবি	শ্রেয়শ্রী ঘোষ	২৫
Rock Skipping	Sanket Paul	25
ফিরে দেখা	বিপ্রজিৎ বিশ্বাস	২৬
আমার দেশ : আমার প্রাণ	ধর্মা মজুমদার	২৭
আমাদের দেশ	সুতনু বোস	২৭
বাস্তবের মূল্যবোধ	অনিক মণ্ডল	২৮
বৃদ্ধাশ্রম	রত্নদীপ সাঁতরা	২৮
বন্দীশালার অস্ত্রাগার	অর্ঘ্য সাহা	২৯
বার্তা	সাগ্নিক মণ্ডল	২৯
বৃষ্টির অপেক্ষায়	ভুবন সাহা	৩০
পরমসাথী	দীপরাজ রায়চৌধুরী	৩০
শেষ প্রান্তর	অরিত্র মণ্ডল	৩১
বই	প্রতীতি চৌধুরী	৩২

সূচিপত্র

নারী	রাখী ভৌমিক	৩২
নীড় কথা	অঞ্জন বিশ্বাস	৩৩
সবচেয়ে সুন্দর	সায়ন্তন বিশ্বাস	৩৩
Teacher's Day	Aditya Mondal	34
Teacher	Sattwik Majumdar	34
Identity	Kushal Karmakar	35
Holi	Srija Saha	35
A Quest	Tanika Ray	36
Best School of Life	Subir Kr Saha	37
অসম্পূর্ণ ডাইরি লেখা	অভিরাজ সরকার	৩৮
মানুষ না ভূত	সোহম দেবনাথ	৩৯
ভালোবাসি তাই	দীপ্তপর্ণী লাহিড়ী	৪০
ক্যামেরা	প্রিয়াস বণিক	৪২
এককথায় প্রকাশ	উজান দাস	৪৩
মুক্ত বিহঙ্গ	অভিপ্সিতা মিত্র	৪৪
A Strange Place	Simantini Sarkar	45
The Ant and The Grasshopper	Sarthak Bhale	45
জিনিয়া	তৃণা ভট্টাচার্য্য	৪৬
রামলালের আত্মকথা	ঋষিকা বিশ্বাস	৪৭
প্রাক্তন	ইন্দ্রনীল মণ্ডল	৪৮
তুমি কত সুন্দর	অর্কদেব বোস	৪৯
Mobile Phone — Advantage & Disadvantage	Neha Das	51
ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যে কথা মনে রাখতে হবে	গোপাল চন্দ্র তালুকদার	৫২
চাকদহ রামলাল একাডেমী ঃ প্রেক্ষাপট ও কিছু কথা	বিজন কুমার চক্রবর্ত্তী	৫৬
প্রবাদ প্রবচনে - বাঙালীজীবন	রাখী ভৌমিক	৬০
Mars Gas	Debkumar Mandal	61
A Russian Tête-à-Tête	Tanika Ray	63
Milky Way Galaxy	Uma Shankar Chatterjee	68
Tips for My Beloved Students	Pradip Kumar Sarkar	70
মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত	বিপুল রঞ্জন সরকার	৭১
প্রসঙ্গ ঃ চাকদহ রামলাল একাডেমি	ড. রিপন পাল	৭৯
জাতীয় সেবা প্রকল্প (NSS) ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে, চাকদহ রামলাল একাডেমি	সাধন মণ্ডল	৮২
মেঘের রাজ্যে মেঘালয়ে কয়েকদিন	শ্রীজিতা রায়	৮৫
কাঞ্চনজঙ্ঘা ও আমি	জিষ্ণু দাস	৮৭
Travel to Sikkim	Dishan Kha	88

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ – ২০২৩

সভাপতি	ঃ	শ্রী মানবেন্দ্র দত্ত
সম্পাদক	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
শিক্ষামোদি সদস্য	ঃ	শ্রী অভিজিৎ মণ্ডল
শিক্ষামোদি সদস্য	ঃ	শ্রী স্বপন সরকার
সদস্য (সরকারী আধিকারিক)	ঃ	এস.আই. অব স্কুলস্, চাকদহ আরবান সার্কেল
সদস্য (চিকিৎসক)	ঃ	সুপারিনটেনডেন্ট, চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল
অভিভাবক সদস্য	ঃ	শ্রী শ্যামল কুমার বিশ্বাস
অভিভাবক সদস্য	ঃ	শ্রী অজয় কুমার সিংহ রায়
শিক্ষক প্রতিনিধি	ঃ	শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার
	ঃ	শ্রী দেবকুমার মণ্ডল
		শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী
শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি	ঃ	শ্রী শংকর চ্যাটার্জী

কর্মচারী সংসদ (স্টাফ কাউন্সিল)

সভাপতি	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
সম্পাদক	ঃ	শ্রী সাধন মণ্ডল, সহ-শিক্ষক

শিক্ষা সংসদ (একাডেমিক কাউন্সিল)

সভাপতি	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
সম্পাদক	ঃ	শ্রী সোমনাথ মজুমদার, সহকারী প্রধান শিক্ষক
সদস্য	ঃ	শ্রী পরিতোষ উকিল, শ্রীমতী পারমিতা পাল
		শ্রী কৃষ্ণপদ সরকার

অর্থ উপসমিতি

সভাপতি	ঃ	শ্রী মানবেন্দ্র দত্ত
সম্পাদক	ঃ	ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক
সদস্য	ঃ	শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

প্রধান শিক্ষক

১।	ডঃ রিপন পাল	-	এম.এসসি., বি.টি., পিএইচ.ডি.

সহকারী প্রধান শিক্ষক

২।	শ্রী সোমনাথ মজুমদার	-	এম.এসসি., বি.টি., সি.আই.টি.এ.

সহ শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দ

৩।	শ্রী শ্যামল কুমার বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.টি.
৪।	শ্রী দেবকুমার মণ্ডল	-	এম.এ., বি.টি.
৫।	শ্রী নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস	-	এম.এ. (ট্রিপল), বি.টি., ডি.আই.টি.এ., এম.সি.এ.
৬।	শ্রী গোপালচন্দ্র তালুকদার	-	এম.এ., বি.এড.
৭।	শ্রী সুবীর কুমার সাহা	-	এম.এ., বি.এড.
৮।	শ্রী বিজন কুমার চক্রবর্ত্তী	-	এম.এ., বি.এড.
৯।	শ্রী রোহিত কুমার পাল	-	এম.এসসি., এম.এড., পি.জি. ডি.সি.এ
১০।	শ্রী শিব প্রসাদ বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.এড.
১১।	শ্রী বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.এড.
১২।	শ্রীমতী দীপ্তি দত্ত	-	এম.এ., বি.এড.
১৩।	শ্রী নিশীথ মণ্ডল	-	বি.এসসি., এম.পি.এড.
১৪।	মহঃ সাইফুদ্দিন মোল্লা	-	এম.এসসি., বি.এড.
১৫।	শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার	-	এম.এ. (ডবল), বি.এড. [ইংরাজী মাধ্যমের ভারপ্রাপ্ত এবং প্রধান শিক্ষক ও সহ প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত]
১৬।	শ্রী তারক নাথ চন্দ	-	বি.এ. (অনার্স), বি.এড.
১৭।	শ্রী পরিতোষ উকিল	-	এম.এসসি., বি.এড.
১৮।	শ্রী সমীর কুণ্ডু	-	এম.এ., বি.এড.
১৯।	শ্রী কৌশিক দেবনাথ	-	এম.এ., বি.এড.
২০।	শ্রী শম্ভুনাথ বসু	-	এম.এসসি., এম.বি.এ. ডি.আই.টি.এ., বি.এড.
২১।	শ্রীমতী বৈশাখী ব্যানার্জী	-	এম.এ., বি.এড.
২২।	শ্রী আনন্দ মণ্ডল	-	এম.এ., বি.এড.
২৩।	শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী	-	এম.কম., এম.এ., বি.এড. (এন.এসএস. প্রোগ্রাম অফিসার)
২৪।	শ্রীমতী পারমিতা পাল	-	বি.এসসি. (অনার্স), বি.এড.
২৫।	শ্রী পরিতোষ মণ্ডল	-	বি.এসসি. (অনার্স), বি.এড.
২৬।	শ্রী গোপাল মল্লিক	-	এম.কম., এম.এ., বি.এড.
২৭।	শ্রীমতী মৌমিতা ঘোষ চৌধুরী	-	এম.কম., বি.এড.
২৯।	শ্রী মিলন শর্মা	-	এম.এসসি., বি.এড.

৩০।	শ্রী চন্দন ঘোষ	-	এম. এসসি., সি. সি. এইচ., এম. সি. আই. টি. এ., বি. এড.
৩১।	শ্রী কৃষ্ণপদ সরকার	-	বি.এসসি. (অনার্স), এম.সি.এ., বি.এড.
৩২।	শ্রীমতী মৌমুক্তা দত্ত	-	এম.এসসি., বি.এড.
৩৩।	শ্রী পরিমল জোয়ারদার	-	এম.এসসি., বি.এড.
৩৪।	ড. সৌমেন দে	-	এম.এসসি., বি.এড., পি.এইচ.ডি.
৩৫।	শ্রী আশিস বৈদ্য	-	এম.এ., বি.এড., বি.এল.আই.এসসি.
৩৬।	শ্রী সাধন মণ্ডল	-	এম.এ. (ডবল), বি.এড.
৩৭।	শ্রী অঞ্জন বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.এড.
৩৮।	শ্রীমতী মৌমিতা দাস	-	এম.এ. (ডবল), বি.এড.
৩৯।	শ্রীমতী শম্পা বিশ্বাস	-	এম.এ., বি.এড.
৪০।	শ্রীমতী রীনা বৈদ্য	-	এম.এ., বি.এড., এল.এল.বি.
৪১।	শ্রী নৃপেন মণ্ডল	-	এম.কম., বি.এড.
৪২।	শূন্যপদ		
৪৩।	শূন্যপদ		
৪৪।	শূন্যপদ		
৪৫।	শূন্যপদ		

পার্শ্ব শিক্ষক - শিক্ষিকা

১।	শ্রীমতী চন্দনা বিশ্বাস	-	এম.এ.
২।	শ্রীমতী মুক্তি বিশ্বাস	-	এম.এ.
৩।	শ্রী উজ্জ্বল শীল	-	বি.এ. (অনার্স)

ভোকেশনাল কোর্সের শিক্ষক - শিক্ষিকা

১।	শ্রী রবিউল মণ্ডল	-	(টেলিফোন ও মোবাইল সেট রিপেয়ারিং)
২।	শ্রী সুদীপ সরকার	-	ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ('ও' লেবেল ডোয়েক)
৩।	শ্রী পার্থ রায়	-	ইলেকট্রনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, পি.ডি.সি.এ.
৪।	শ্রী শিবব্রত দাস রায়	-	এম.এসসি. এম.বি.এ.
৫।	শ্রী সঞ্জয় সূত্রধর	-	এম.এ.
৬।	শ্রী রণজিৎ মণ্ডল	-	এম.এসসি.
৭।	শ্রীমতী রাখী ভৌমিক	-	এম.এ.
৮।	শ্রী সুশান্ত শর্মা	-	এইচ.এস., আই.টি.আই. (কার্পেন্ট্রি)
৯।	শ্রীমতী মিঠু রায়	-	এম.এসসি.
১০।	ডা. সানুজিৎ বসু	-	বি.এসসি., ডি.এম.এস., ডিপ্.এন.আই.এইচ, সার্টিফিকেট ইন স্পোর্টস সায়েন্স।

গ্রন্থাগারিক

১। শ্রীমতী শাশ্বতী সেন - বি.এসসি. (অনার্স), এম.লিব., এস্.সি।

আই.সি.টি. ইন্‌স্ট্রাক্টর

১। শ্রী নীলাদ্রি মণ্ডল - বি.এ., ডিপ্লোমা

সি.এল.টি.পি. ফ্যাকাল্টি

১। শ্রী সমিত মণ্ডল - বি.এ.
২। শূন্যপদ

করণিক

১। শ্রী সুনীল কুমার সরকার - বি.এ.
২। শ্রী শুভায়ন দে - এইচ. এস.
৩। শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী - বি.এসসি.

শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১। শ্রী কল্লোল পাল চৌধুরী - বি.কম.
২। শ্রী শুভ্র প্রকাশ সিংহরায় - এম.এ.
৩। শ্রী শঙ্কর চ্যাটার্জী - অষ্টম উত্তীর্ণ
৪। শূন্যপদ
৫। শূন্যপদ

ভোকেশনাল কোর্সের শিক্ষাকর্মী

১। শূন্যপদ

সাম্মানিক খণ্ডকালীন শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী

১। শ্রীমতী সুলগ্না ব্যানার্জী - বি.কম. (অনার্স), এম.বি.এ.
২। শ্রীমতী গার্গী ঘোষ বর্ধন - বি.এসসি. (অনার্স)
৩। শ্রীমতী মেঘা মুখার্জী - বি.এ. (অনার্স)
৪। শ্রীমতী সায়ন্তি মণ্ডল - বি.এসসি. (অনার্স)
৫। শ্রীমতী সুস্মিতা বসু - বি.এ. (হিন্দী)
৬। শ্রী সায়ন্তন বিশ্বাস - বি.এ.
৭। শ্রীমতী প্রিয়ম দেব বিশ্বাস - বি.এ. (অনার্স) ডি.এল.এড.
৮। শ্রীমতী তৃণা ভট্টাচার্য্য - এম.এ. বি.এড.
৯। শ্রীমতী তনিমা সোম - এম.এস.সি. বি.এড.
১০। শ্রীমতী প্রতীতি চৌধুরী
১১। শ্রীমতী মৌ মণ্ডল - এম.এ., বি.এড.

পত্রিকা উপ-সমিতি

উপদেষ্টা মণ্ডলী ▸▸ ড. রিপন পাল, সোমনাথ মজুমদার
শ্যামল কুমার বিশ্বাস, দীপ্তি দত্ত
তারকনাথ চন্দ, সুনীল কুমার সরকার

যুগ্ম সম্পাদক ▸▸ সাধন মণ্ডল
নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস

সদস্য / সদস্যা ▸▸ গোপাল চন্দ্র তালুকদার, প্রদীপ কুমার সরকার, সমীর কুন্ডু, মৌমিতা দাস, সৌমেন দে, অঞ্জন বিশ্বাস, প্রিয়াংকা অধিকারী, বৈশাখী ব্যানার্জী, দেবকুমার মণ্ডল, গোপাল মল্লিক, শাশ্বতী সেন।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্ম-বিষয়ক উপ সমিতি

ক্রীড়া উপসমিতি

নিশীথ মণ্ডল (আহ্বায়ক)
তারকনাথ চন্দ, সইফুদ্দিন মোল্লা, গোপাল মল্লিক, বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, নৃপেন মণ্ডল, সমীর কুণ্ডু, ড. সৌমেন দে, মিলন শর্মা।

বিদ্যালয় পত্রিকা উপসমিতি

সুবীর কুমার সাহা (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
কৌশিক দেবনাথ (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
গোপাল চন্দ্র তালুকদার, দেব কুমার মণ্ডল, সাধন মণ্ডল, প্রদীপ কুমার সরকার, তারকনাথ চন্দ, বৈশাখী ব্যানার্জি, শাশ্বতী সেন, অঞ্জন বিশ্বাস।

শৃঙ্খলারক্ষা উপসমিতি

প্রদীপ কুমার সরকার (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
রিনা বৈদ্য (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
শ্যামল কুমার বিশ্বাস, সইফুদ্দিন মোল্লা, কৌশিক দেবনাথ, পরিমল জোয়ারদার, পরিতোষ উকিল, আনন্দ মণ্ডল, পারমিতা পাল, শম্পা বিশ্বাস, শংকর চ্যাটার্জী।

বিজ্ঞান ও প্রদর্শনী উপসমিতি

মিলন শর্মা (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
কৃষ্ণপদ সরকার (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সোমনাথ মজুমদার, বিজন কুমার চক্রবর্তী, রোহিত কুমার পাল, শিবপ্রসাদ বিশ্বাস, শম্ভুনাথ বসু, চন্দন ঘোষ, পরিমাল জোয়াদার, পরিতোষ উকিল, ড. সৌমেন দে, পারমিতা পাল।

সংস্কৃতি বিষয়ক উপসমিতি

সাধন মণ্ডল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
মৌমুক্তা দত্ত (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
দেব কুমার মণ্ডল, গোপাল চন্দ্র তালুকদার, নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস, সুবীর কুমার সাহা, শিবপ্রসাদ বিশ্বাস, শম্ভুনাথ বসু, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মণ্ডল, মৌমিতা দাস, শম্পা বিশ্বাস, মুক্তি বিশ্বাস, চন্দনা বিশ্বাস, প্রিয়াঙ্ক অধিকারী।

অবসরকালীন বিদায় সম্বর্ধনা বিষয়ক উপসমিতি

কৌশিক দেবনাথ (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সমীর কুণ্ডু (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
দেব কুমার মণ্ডল, শম্ভুনাথ বসু,
বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, আশিস বৈদ্য,
তারকনাথ চন্দ, গোপাল মল্লিক,
চন্দন ঘোষ, মৌমুক্তা দত্ত,
পারমিতা পাল, সুনীল কুমার সরকার।

পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যায়ন বিষয়ক উপসমিতি

গোপাল মল্লিক (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সৌমেন দে (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
বিজন কুমার চক্রবর্তী, নিশীথ মণ্ডল,
তারক নাথ চন্দ, মৌমিতা ঘোষ চৌধুরী,
আশিস বৈদ্য, আনন্দ মণ্ডল,
রিনা বৈদ্য, অঞ্জন বিশ্বাস,
উজ্জ্বল শীল, কল্লোল পাল চৌধুরী।

নির্মাণ কার্য সংক্রান্ত উপসমিতি

দেব কুমার মণ্ডল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
প্রদীপ কুমার সরকার (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সাধন মণ্ডল, পরিতোষ উকিল,
রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী, নৃপেল মণ্ডল,
শুভ্র প্রকাশ সিংহ রায়।

বিশ্ব বিজ্ঞান মেধা-অন্বেষণ উপসমিতি

সমীর কুণ্ডু (আহ্বায়ক)
দেব কুমার মণ্ডল, প্রদীপ কুমার সরকার,
গোপাল মল্লিক, সাধন মণ্ডল, নৃপেন মণ্ডল,
শুভায়ন দে।

দ্বিপ্রাহরিক আহার সংক্রান্ত উপসমিতি

ড. রিপন পাল
সোমনাথ মজুমদার, প্রদীপ কুমার সরকার,
পরিতোষ মণ্ডল, মৌমিতা দাস,
রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী, কৃষ্ণপদ সরকার,
পরিতোষ মণ্ডল, পারমিতা দাস।

ক্রেতা সুরক্ষা উপসমিতি

আশীষ বৈদ্য (আহ্বায়ক)
নৃপেন মণ্ডল, সমীর কুণ্ডু।

সাইবার উপসমিতি

ড. সৌমেন দে (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
নৃপেন মণ্ডল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
রোহিত কুমার পাল, গোপাল মল্লিক,
কৃষ্ণপদ সরকার, শুভায়ন দে।

গ্রন্থাগার উপসমিতি

শাশ্বতী সেন (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
আশীষ বৈদ্য (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
গোপাল চন্দ্র তালুকদার, শ্যামল কুমার বিশ্বাস,
প্রদীপ কুমার সরকার, তারকনাথ চন্দ,
বৈশাখী ব্যানার্জি, অঞ্জন বিশ্বাস, চন্দনা বিশ্বাস।

পুরস্কার ও বৃত্তি বিষয়ক উপসমিতি

পরিতোষ উকিল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
গোপাল মল্লিক (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
দেব কুমার মণ্ডল, সমীর কুণ্ডু,
রিনা বৈদ্য, শাশ্বতী সেন।

Government of West Bengal
OFFICE OF THE DISTRICT INSPECTOR OF SCHOOLS (S.E.), NADIA.
SHIKSHA BHAWAN, COLLEGE STREET,
KRISHNAGAR, NADIA, PIN-741101.

Message

I am highly elated with joy to know that Chakdaha Ramlal Academy, a renowned and excellent educational institution in the district of Nadia is going to publish their bilingual annual magazine through both offline and online mode.

The school magazine, me thinks, is a multi dimensional document of the growth and abundance of a school, in short, a face of an institution. It helps the future generation of students related to the culture and tradition built up of their school. This valuable publication is the opportunity that students require to show their creative and critical talents. I think this magazine is certainly a wonderful platform where students are exposed to broad spectrum of texts and lots of interactive content.

I think this analytic scope and opportunity rendered by Chakdaha Ramlal Academy will be a gateway to wonderful enlightenment.

Chakdaha Ramlal Academy has been rendering service with utmost sincerity and cordial aspiration to promote education among the bonafide students. The flourishing prospect and prosperity of this institution deserves special attention.

On this auspicious occasion I convey my heartiest felicitation to the members of magazine sub-committee, students, management staff, all teachers & non-teaching staff, especially the Headmaster of this pioneering institution.

Dated, Krishnagar
12th May, 2023

12/05/2023

District Inspector of School (S.E.), Nadia

To:

Dr. Ripan Paul
Headmaster,
Chakdaha Ramlal Academy
Chakdaha, Nadia
Pin - 741222.

DR. CHIRANJIB BHATTACHARYA
PRESIDENT
WEST BENGAL COUNCIL OF HIGHER
SECONDARY EDUCATION

Vidyasagar Bhavan
9/2, Block-DJ, Sector-II
Salt Lake, Kolkata-700 091
Phone : 2359-6526 (O)
9836655333 (M)
9836402118 (M)
Tele Fax : (033) 2334 5541 (Office)

No. L/PR/123/2023

Date 15/05/2023

To:
The Headmaster,
CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY (H.S.)
P.O. – Chakdaha, Dist. – Nadia,
West Bengal, Pin - 741222.

I am glad to know that **CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY (H.S.)** is going to publish annual Magazine, containing various articles on the academic achievement of the institution.

I am aware that during this period the institute has rendered yeomen's service to the society since its inception and the institute also has produced many brilliant students under the proper guidance of the qualified teachers.

On the auspicious occasion I convey my sincere greetings and good wishes to the Teachers, Employees, Students, Members of the Managing Committee and those who are associated with this institution.

I also convey my best wishes for the success of the annual Magazine of **CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY (H.S.).**

(Dr. Chiranjib Bhattacharya)
President, WBCHSE

Office of the Assistant Inspector of Schools (S.E.)
Kalyani Sub Division
Suit No.-9, 2nd Floor, D.C. Building
P.O. - Kalyani, Dist - Nadia, Pin-741235. email id : aikalyani2017@gmail.com

Memo No. - 49/Kly/SE. Date – 17/05/2023

MESSAGE

I am very glad to know that **Chakdaha Ramlal Academy**, Chakdaha, Nadia, West Bengal, a century-old educational institution is going to publish its annual School Magazine. School Magazines have a great educative value. It encourages students to think and write. In fact, young students find its first exposure through this medium. The magazine also reflects the achievements and other activities of the institution. It records the history of the institution, thereby recording the history of the community as well.

I hope that this publication would also be successful in achieving these objectives. I extend my warm wishes to the Headmaster, Staff and Students of Chakdaha Ramlal Academy to continue this journey.

Mehebub Asif Jamon

Assistant Inspector of School (S.E.)
Kalyani Sub-Division, Kalyani, Nadia

স্মারক বৃত্তি

১। **শশিভূষণ তারকদাসী স্মারকবৃত্তি ঃ** ৫,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীকে সমভাবে আর্থিক এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হবে।

২। **১৯৫৮ সালের পরীক্ষার্থী, প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত, ৭,০০০ টাকার সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নবম দশম শ্রেণীর নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে এককালীন বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

৩। **প্রদোষ কুমার রায় স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৫,০০০ টাকা থেকে প্রাপ্ত সুদ সমভাবে স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাসে ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের বৃত্তিরূপে দেওয়া হবে।

৪। **প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী শংকর নাথ সরখেল দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১০ হাজার টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের সমভাবে বৃত্তিরূপে দেওয়া হবে।

৫। **নিবেদিতা চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫০,৫০১ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে বাণিজ্য বিভাগের উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে প্রদত্ত বৃত্তি।

৬। **রাধিকা মোহন কর স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২০,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

৭। **পণ্ডিত সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃত বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

৮। **সুব্রত চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১০,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে বৃত্তি দেওয়া হবে।

৯। **১৯৫৮ সালের ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দের দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫৭,০০০ (সাতান্ন হাজার) টাকার সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পুস্তক ক্রয় / শিক্ষোপকরণ ক্রয় / বার্ষিক পরীক্ষার ফি ইত্যাদি আর্থিক সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

১০। **আয়ন্তী সরকার স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১৭,০০০ (সতের হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নির্বাচিত গরীব ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

১১। **মধুসূদন মণ্ডল স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নির্বাচিত প্রকৃত দুঃস্থ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

১২। **পারুলদেবী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র/ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৩। **অভ্রদীপ দাম স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫১,০০০ (একান্ন হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র/ছাত্রীকে অথবা দেরকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৪। **পুষ্প রাণী বসু স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২,৫০,০০০/- (দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে পূর্ণমান, হিসাবশাস্ত্রে সর্বোচ্চ এবং বাংলা ও ইংরাজী বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীকে অথবা দেরকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৫। **অশোক লাহিড়ী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত অর্থ ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নবম থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ভূগোল বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

স্মরণিকা

''চিরবিদায় হে বন্ধু, হে প্রিয়''
''যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।''

যাঁদের মহৎজীবন ও বিপুলকর্ম রামলাল একাডেমির সঙ্গে আন্তরিকভাবে বিজড়িত ছিল! যাঁদের শ্রম ও মেধা প্রকৃত মানুষ গড়ার কাজে, জীবনব্যাপী নিয়োজিত ছিল। যাদের স্নেহ ও প্রশ্রয়ে অসংখ্য শিক্ষার্থী দেশ ও জাতির সম্পদ হয়ে উঠেছে; সেরকম কিছু মহাপ্রাণ, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষা প্রশাসককে আমরা গত বছর চিরতরে হারিয়েছি। যাঁদের ঋণ কখনোই শোধ করা যাবে না।

তাঁদের প্রতি আমরা চির কৃতজ্ঞ হয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অন্তিম শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রী রবীন্দ্র কুমার ব্যানার্জী গত ২৭/০৫/২০২২ তারিখে বার্ধক্য জনিত কারণে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তিনি দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষাদান করেছেন ও শিক্ষা-সংসদের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিদ্যালয়ের কর্মযজ্ঞে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রাক্তন সম্পাদক, অধ্যাপক ডক্টর কনক মৈত্র গত ২৬/১০/২০২২ তারিখে সজ্ঞানে আমাদের থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। ডক্টর মৈত্র দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা প্রশাসক হিসাবে চাকদহ রামলাল একাডেমিতে বিশেষত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিদ্যালয়ের উন্নয়নে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী হরিশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় গত ০৮/০৮/২০২২ তারিখে প্রায় সুস্থ দেহমন নিয়ে পরলোক গমন করেন। শ্রী মণ্ডল ছাত্রদের নিকট একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাব্রতী ছিলেন। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই তাঁদের প্রয়াণে গভীরভাব শোকাহত। আমরা তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।

এছাড়াও ঐ মধ্যবর্তী সময়ে দেশ-বিদেশের প্রয়াত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ক্রীড়াবিদ, সাংবাদিক ও স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি। এছাড়াও বোমা বিস্ফোরণে, পথ দুর্ঘটনায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় ভাবে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

সম্পাদকীয়

বাংলার শিক্ষা মানচিত্রের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'চাকদহ রামলাল একাডেমী'র বার্ষিক সাহিত্য- সংস্কৃতি-বিজ্ঞান পত্রিকা ***"ক্রেওল"*** *যথারীতি প্রকাশিত হলো। এ পত্রিকা নিতান্ত বালক-বালিকা, কিশোর- কিশোরীদের মনের অঙ্গন থেকে উঠে আসা ভাবনার কিছু টুকরো কোলাজ মাত্র! গভীরতর সাহিত্য-দর্শন- বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা এখানে তেমন প্রত্যাশিত নয়! বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কখনো গুরুতর তত্ত্বভাবনার অনুসন্ধানও নয়। আমরা শুধু সুকুমারমতি স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তন ও মননশীলতায় উৎসাহিত করবার চেষ্টা করি মাত্র! ক্রন্দসী-প্রেরিত বারিধারার সবটুকু যেমন সফলতা পায় না — অবশ্যই কিছু নবাঙ্কুরের সৃষ্টি করে; আগামীতে এই ধরা ভরে ওঠে সবুজ বৃক্ষরাজিতে; তেমনই কারো কারো রচনায় দুই-এক কণা, মনি-মুক্তার ঝিলিক আমাদের প্রাণের ইচ্ছাকে উদ্ভাসিত করে; শিক্ষক হিসেবে গর্বিত করে।*

উনবিংশ শতাব্দীর এক ক্রান্তিকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন অমিত-প্রতিভার অধিকারী মহাকবি শ্রীমধুসূদন। তাঁর জীবনের মধ্যে গগনে একদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মহাবিদ্রোহের প্রতিবাদী প্রেক্ষাপট; অন্যদিকে সমাজে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকতার দ্যোতনা — গড়ে উঠছে কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়।

এ বছর বাংলা তথা ভারতের প্রথম আধুনিক কবি শ্রীমধুসূদন দত্তের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী। অথচ ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস, তাঁর আবির্ভাবের ২০০ বছর পূর্তির মধ্যে আমরা হাজারো তুচ্ছ ঘটনায় বিব্রত রয়েছি; আর নিয়ত তাঁকে স্মরণে না রাখার ধৃষ্টতা দেখিয়ে চলেছি। এই অমিতপ্রতিভাধর পুরুষের কথা বাঙালী হৃদয়ের কোন বিস্তৃতির অতলে যেন ডুবে আছে। অথচ বাংলার আর এক তেজস্বী মহাপুরুষ স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "মধুকবি"কে সেকালে প্রথম নাগরিক সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। এবং তিনি যে সমকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত পোষণ করেননি। একবার ভাবুন তো, তখনও রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করেননি; কুসংস্কারের পঙ্কিল আবর্তে যে সমাজ কণ্ঠ পর্যন্ত নিমজ্জিত; যে সমাজের সিংহভাগ নরনারী প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত; সেই রকম ধূসর, অন্ধকার সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে মধুসূদনের মতো ক্ষুরধার সাহিত্য-প্রতিভার জন্ম হয়েছিল! যাঁর অত্যাধুনিক ভাষা-ভাবনা ও সৃষ্টির তাৎক্ষণিক অভিঘাতে বাংলার তথাকথিত বিদ্যা-জীবিরা

দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। যাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন করবার মতো আধুনিকতা, উদারতা ও শিল্পবোধ সমকালীন পণ্ডিতদের ছিল না বললেই চলে! বিদ্যাসাগর ব্যতীত, পরবর্তীকালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির মহত্বে আপ্লুত, অভিভূত হয়েছেন। বিস্মৃতপ্রায় সেই মহাকবির জন্ম দ্বিশতবর্ষে আমরা, এ বছর চাকদহ রামলাল একাডেমির বার্ষিক পত্রিকাকে ''মধুসূদন'' সংখ্যা হিসেবেই মান্যতা দিয়ে প্রকাশ করছি।

''**ক্রেওল**'' যেহেতু বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাহিত্য- বিজ্ঞান পত্রিকা। তাই আমরা এই পত্রিকায় বিদ্যালয়ের কিছু বিদগ্ধ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মূলবান রচনার দ্বারা ঋদ্ধ হয়েছি। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী বিপুল রঞ্জন সরকারের রচনাও পত্রিকাকে আকর্ষণীয় করবে বলে প্রত্যাশা রাখি।

বর্তমান প্রধান শিক্ষক ডক্টর রিপন পাল এবং কার্যকরী সমিতির সদস্য শিক্ষক শ্রী প্রদীপ কুমার সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা ও সুচিন্তিত মতামত পত্রিকা প্রকাশকে ত্বরান্বিত ও সুসংগঠিত করেছে। শিক্ষক শ্রী গোপাল চন্দ্র তালুকদার ও সুবীর কুমার সাহা প্রুফ সংশোধনের কাজে অনেকখানি সাহায্য করেছেন, চাকদহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর শ্রী অচিন্ত্য সাহার সহযোগিতা আমাদের কাজকে অনেকখানি গতি দিয়েছে।

পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের রচনা ও ইচ্ছাকে সবসময়ই অধিকতর গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছি। তবুও যদি তোমাদের কারও রচনা এবছরের পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়ে থাকে, তাতে একটুও আশাহত হবার কোন কারণ দেখি না। আগামী দিনে তোমরা আবারও তোমাদের গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা অত্যন্ত মননশীলতার সঙ্গে নিজেদের পরিপূর্ণ মেধা দিয়ে সৃষ্টি করবে; তখন দেখবে তোমাদের লেখা নিশ্চয়ই ছাপা হবে।

নয় নয় করে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পত্রিকা ৫৩ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। আমরা এ পত্রিকার শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রত্যাশা রাখি।

নিবেদনান্তে

সাধন মণ্ডল

নির্মলচন্দ্র বিশ্বাস

আমাদের ভারত

অর্ঘ আচার্য

ষষ্ঠ শ্রেণি

আমাদের দেশ
আমাদের ভারত।
ভারতই আমাদের গর্ব,
এই দেশেতেই জন্ম আমার —
এই দেশেতেই মরণ।
ভারত আমার প্রাণের দেশ,
ভারতই আমার স্বর্গ।
ভারত আমার হৃদয় মাঝে
তাই-ই আমার ধর্ম।
আছে কত বীর যোদ্ধা —
সুভাষ, ক্ষুদিরাম।
দেশমাতাকে মুক্ত করতে দিয়েছে মহারণ।
ভারতের যে বিশ্বকবি ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ।
বিবেকানন্দ ঠাকুর আমার মানে না জাতপাত
তাইতো আমরা গর্ব করি — সবাই
ভারত মাতার সন্তান।
গর্বে গাহি বঙ্কিম ঋষির —
''বন্দে মাতরম।''

দোল

রণিত আচার

ষষ্ঠ শ্রেণি

এলো বসন্ত
তার সাথে এলো দোল
সবাই কত মজা করে
খেলে তো এই দোল
ছোটো বড়ো সবাই মিলে
কত মজা করে
রাধাকৃষ্ণের পূজা
সবাই মিলে মিশে করে
বছরে আসে একবার দোল
আসে আর চলে যায়
সবাই মিলেমিশে
এই দিনটা খুব আনন্দে কাটায়
সেদিন বাতাসে কত
রঙ মিশে থাকে
ছোটোরা সকাল বেলায়
পিচকারি দিয়ে
রঙ খেলে থাকে
তারপর স্নান করে
সবাই ঘরে ফিরে যায়
ছোটোরা বড়োদের পায়ে আবীর মাখায়।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চাকরি - বাকরি

সৌরিত সরকার

পঞ্চম শ্রেণি

বাবা বলেছিল, 'ভালো করে পড়
হতে হবে তোকে বড়ো'
মা বলল, 'হবে তো হকার'!
তুমি যতোই বারণ করো'।

প্রফেসর, ডাক্তার, শিক্ষক
পুলিশ, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার,
কোন কাজ করলে তবেই
মন জেতা যায় সবার।।

সবাই তো এই প্রশ্নটা করে
'বড়ো হয়ে কী হবে? বলো',
দিদি বলে, 'আমি প্রফেসর হব'
বাঃ! মেয়েটাতো খুব ভালো।

আমাকেও তাই শুধায় সবাই
একই প্রশ্ন করে,
বিরক্ত আমি বারবার বলি,
'উত্তর পাবে পরে'।।

আমার প্রিয় মানুষ

অর্ণব দাস

পঞ্চম শ্রেণি

গাংনাপুর, কুলগাছি, পায়রাডাঙ্গা, চাকদহ
দেখেছি কত সুন্দর স্থান,
আমার জীবনের প্রিয় মানুষ অরুণ দত্ত
উদাত্ত মহাপ্রাণ।
স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরী করতেন রাণাঘাটে,
সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির,
আড়ংঘাটা প্রণবানন্দ, লোকনাথ, চূর্ণীনদী
কী সুন্দর হাসিমুখ, সব সময় ধীরস্থির।
অরুণ জেঠু যেখানে আছো
থাক তুমি শান্তিতে,
নির্লোভ সোনার মানুষ
বিখ্যাত ছিল নদীয়াতে।

সাপুড়িয়া

সৌভিক দাস

সপ্তম শ্রেণি

এক ছিল সাপুড়িয়া,
সাপ ধরা তার কারবার।
সাপ নিয়ে ওঠাবসা,
তাই নিয় সংসার।
ছোট সাপ বড়ো সাপ,
ঝুড়ি তার ভরতি!
অজগর পেলে তার,
হয় বড়ো ফুরতি।
একদিন ডেকে দেখি, সাপ নেই ঝুলিতে।
ঘুরে তার আনন্দ - বাড়ি বাড়ি গলিতে।

বৃষ্টি

সুভম দে
ষষ্ঠ শ্রেণি

বৃষ্টি পড়লে
প্রকৃতির গাছ যে নড়ে
বৃষ্টিতে ভিজলে
শরীর যে ছমছম করে
অতি বৃষ্টি হয় যদি
তবে দিকে দিকে হয় বন্যা
তবু বৃষ্টি পড়লে পাই
দারুণ মজা
বর্ষা দিনে,
খাওয়া যায়, খিচুড়ি আর
ইলিশ মাছ ভাজা।
কিন্তু শরৎ কালে
বৃষ্টি পড়লে হয় ভীষণ কষ্ট,
মস্ত বড়ো পুজোটা
তখন হয়ে যায় যে নষ্ট।
শরৎকালটা ভাই
সুখ-দুঃখ দু-ই মিলিয়ে যাই
ওগো বর্ষাকালে তাই
আমরা বর্ষার গান গাই।

বর্ষা এল

আখিরুল মণ্ডল
ষষ্ঠ শ্রেণি

গুড় গুড় মেঘ ডাকে
ঐ এল বৃষ্টি।
দরজা জানলা খোলা
ভেসে যায় দৃষ্টি।
বৃষ্টিতে অনেক মজা
লাগাবো অনেক গাছ।
দুপুর বেলা পেট ভরে খাব
খিচুড়ি ও ভাজা মাছ।
বৃষ্টির জলে ভিজলে
পায় যত মজা।
কাদার মধ্যে পড়ে গেলে
পায় তত সাজা।
ঘরে বসে খাও শুধু
পাকা পাকা আম
খেতে খেতে চেয়ে দ্যাখো
আকাশটা মেঘ-ধাম।

"হৃদয়হীন সেবা নয়,
মানুষ চাই তোমার অন্তরের স্পর্শ।"

— মাদার টেরেসা

লক্ ডাউন

অঙ্কুশ বিশ্বাস

ষষ্ঠ শ্রেণি

লক্ ডাউন লক্ ডাউন লক্ ডাউন,
খেলা বন্ধ, পড়া বন্ধ, স্কুলে যাওয়া বন্ধ।
বন্ধুদের সাথে দেখা হয় না,
বাড়ি বসে তো ভালো লাগে না।
কী আর করি মনের দুখে,
বসে থাকি ঘরের এক কোণে।
একদিন কাটবে এই ভয়,
করোনাকে ভাগাবো নিশ্চয়!
আর কোনদিন তারে করবোনা ভয়।
করোনাকে একদিন করবই জয়!

বিচিত্রময় পৃথিবী

পৃথ্বিজীৎ সমাদ্দার

সপ্তম শ্রেণি

অন্ধকার কালো হয়,
আলো হয় সাদা
বাড়ি থেকে বেরোলে দেখবে,
মাঠে ফলে আদা,
লঙ্কা খেতে ঝাল লাগে
আখ খেতে মিষ্টি
জানো কী তোমরা, চিনি
আখ থেকেই সৃষ্টি,
রসগোল্লা, কালাকাঁদ
খেতে ভারি ভালো,
জেব্রার রং হয়
শুধুই সাদা কালো।

টাকা

তির্ষাণ মালো

ষষ্ঠ শ্রেণি

একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ
টাকা মানুষের জীবনের লক্ষ
তিনে নেত্র, চারি বেদ
টাকা মানুষের বাড়ায় মেদ,
পাঁচে পঞ্চবান, ছয়ে ঋতু
টাকা মানুষকে বানায় নিচু
সাতে সমুদ্র, আটে অষ্টবসু
টাকা মানুষকে বানায় পশু,
নয়ে নবগ্রহ, দশে দিক,
টাকা মানুষের অ-সৎ দিক।

আদর্শ হাইস্কুল

সুদীপ বিশ্বাস

ষষ্ঠ শ্রেণি

আমাদের স্কুল পাঁচিলেতে ঘেরা
সারাদিন বকবক করে ছাত্ররা।
যেদিন থাকে পাঁচ, হয় মাত্র তিন ক্লাস
বাকি সময় সবাই ক্লাসে করে নাচ তাধিন ধিন।
তখন মনিটর হয়ে যায় পাগল,
সামলাতে সামলাতে ওইসব ছাত্র, লাইক ছাগল।
সারাদিন মনিটরদের খারাপ হয় হাল
মনিটরের কথায় স্যার-ম্যাম তোলে সবার ছাল।
আমরা টিফিনে মজা করে খাই,
এতেই শেষ নয়, তারপর বাইরে যাওয়ার জন্য
গেটে গিয়ে সটান দাড়াই।
হুড়োতাড়া করি বলে, স্যারের লাঠির বাড়ি খাই
শেষমেষ একটু শুধু খেলতে পাই।
খেলা তো আর খেলা নয়, দোকানে গিয়ে
আইসক্রিম খাই।
এবার তো হল অনেক, স্কুল হল ছুটি,
হৈ চৈ, বাড়ি যাই, আনন্দে ভরপুর।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

সপ্তপর্ণী সরকার

অষ্টম শ্রেণি

নিউটন একজন বিজ্ঞানী
তাঁর নাম কী তুমি শোনোনি?
বলো তো কী তাঁর আবিষ্কার?
বদলালো যা জীবন সবার।
বলো দেখি কে কলম্বাস?
যদি পারো তবে 'সাব্বাস'!
জানো কে মারকোনি?
কি-বা তাঁর খ্যাতির খনি?
কি হলো? চুপ কেন?
সময় নিচ্ছ? নাও।
'সঠিক উত্তর পাই যেন।।
নইলে ভাবনা কেন?
উত্তর জেনে নাও।
নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ
এই পৃথিবীর টান,
কলম্বাসের আবিষ্কার
বাঁচাল তাঁর প্রাণ!
মারকোনি করলেন চুরি,
জগদীশের 'রেডিও',
জেনেছো তো? এবার তবে
হাততালিটা আমায় দিও।
দেখে শিখে, জেনে শুনে,
বাড়াও নিজের জ্ঞান —
অতটাও কঠিন নয়
আমাদের বিজ্ঞান।।

মা ও ছেলে

সুকৃত মণ্ডল

ষষ্ঠ শ্রেণি

মায়ের আমি ছোট্ট বাবি,
থাকি সারাদিন মায়ের সাথে,
মা যখন ডাকে, বাবি কোথায় গেলি?
আমি তখন লুকোই মায়ের আঁচল ধরে।
মা যখন সকালে ঘুম থেকে ডাকে
আমি তখন চুপটি করে শুয়ে থাকি।
আমি যখন বলি দিদি তোমার সব থেকে প্রিয়
মা বলেন এসব কথা ভাববেনা আর কখনো।
স্কুলে যাবার পথে ট্রেন ছুটছে যখন
মায়ের কাছে করছি খালি বক-বকম।
মা বকে দেয় বড্ড তোমার বেড়েছে
রাতে শোবার সময় যখন বলি,
ঐ দেখ মা ভূত।
মা বলেন, এ বার বাবি বন্ধ করো তোমার দুষ্টমি।

পুজোয় বিপদ

শিঞ্জন ব্যানার্জী

ষষ্ঠ শ্রেণি

সেদিন সন্ধায় হচ্ছিল বেশ কালী পূজাটি,
ঢাক বেজেছে, শাঁখ বেজেছে, সময় জমজমাটি।
পুজোর সময় আনন্দটা হচ্ছিল খুব ভালো,
চারিদিকে তখন শুধুই প্রদীপেরই আলো,
আস্তে আস্তে লোকজন সব আমাদের বাড়ি আসে,
পুজোর পরে তখন সবাই পেটপুজোতে বসে।
খাওয়া-দাওয়া হইহুল্লোড় সবই চলছিল,
কোত্থেকে এক উটকো বিপদ ঘরের মধ্যে এলো।
চারিদিকে সব মৌমাছিরা ঘিরে ফেলেছে বাড়ি,
প্রাণ বাঁচাতে সবাই তখন করল দৌড়াদৌড়ি।
মৌমাছির কামড় খেয়ে, অনেকেই ডাক্তার খানায়,
ওষুধ-পত্র খাওয়ার পরে, একটু শান্তি পায়।
বলতে গেলে এটা ছিল এক মরণ-বাঁচন যুদ্ধ,
কিছু লোক অক্ষত, কিছু আঘাত প্রাপ্ত।
এবার পুজোয় সব আনন্দ নষ্ট হয়ে গেছে,
পরের বছর এমন বিপদ আর যেন না আসে।

বই পড়াটা যে শিক্ষার একটি সুবিধাজনক সহায়মাত্র তাহা আর আমাদের মনে হয় না, আমরা বই পড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষ

রূপম নন্দী

ষষ্ঠ শ্রেণি

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ,
শত্রুরা করতে পারেনা স্পর্শ।
মহানব্যক্তি নেতাজী, বিবেকানন্দ,
তাঁদের আদর্শে পাই মহানন্দ,
ব্রিটিশরা করেছিল ভারত পরাধীন,
ক্ষুদিরাম-বাঘাযতীন তাঁদের রক্তে
হয়েছে স্বাধীন

মাতৃভূমি ভারতবর্ষ মোদের গর্ব
শত্রুর ভয়ে আমরা কখনো না মরবো।

শপথ

সায়ন সরকার

সপ্তম শ্রেণি

দৃঢ় কর তোমার চেষ্টা - মন
রক্তে ঝরুক আকুল ঝড়
চোখেতে তোমার মেখে নাও
শপথের শত রং
দৃঢ় কর তোমার হাত
হৃদয়ে রাখো কর্ম - শপথ।
জীবনের জয় নিশ্চিত
তুমি বাস্তবের নায়ক।
অবিলম্বে দাড়াবে তুমি
বাস্তবের হাত ধরে;
দু'চোখে ঝরবে স্বপ্ন
তখন খুশির উল্লাসে।

হারিয়ে গেছি আমি

চন্দ্রিমা মুখোপাধ্যায়

সপ্তম শ্রেণি

যদি -হতাম প্রজাপতি,
রঙিন ডানা মেলে উড়ে যেতাম,
দূর নীলিমায় সূর্যের আলো মেখে,
ফুলের বুকে বসতাম সর্বক্ষণ।

রোদ বৃষ্টির খেলায় হারিয়ে যেতাম,
সবুজ ঘাসের কোনায় কোনায়,
ছোট্ট শিশুরা নিয়েছে পিছু আমায়,
যখন বসতাম গিয়ে ফুলের উপর।

আজ আমার মনে ভীষণ ব্যথা
সবুজ বাগানে উঠেছে আধুনিক মানুষ-সভাত্য।
চলেছে সবুজ নিধন দিবারাত্র,
আজ আমি অবলুপ্ত মানব সভ্যতায়।

"ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

অবোধ পোলাপান

অংশুমান বিশ্বাস

অষ্টম শ্রেণি

স্কুল মানে চার দেওয়ালে
বন্দী জীবন শুধু হাসতে মানা
আইনস্টাইন-ও ইস্কুলটাকে
ভাবত কয়েদখানা।

বন্ধুরা মিলে যখনই করেছি
দুষ্টুমি ভরা কীর্তি,
স্যার ম্যাডামরা টের পেয়ে গিয়ে
হয়েছেন অগ্নিমূর্তি।

যতই হোক অসুবিধা
বুঝতে ব্যাকরণের সন্ধি,
মুখস্থ না হলে বাংলা স্যার
পিঠে ভাঙেন কঞ্চি।

ইতিহাসের ওই সালগুলো যেন
মূর্তিমান বিভীষিকা,
ঘাম ছুটে যায় বুঝতে রাসায়নের
রাসায়নিক বিক্রিয়া।

পাহাড় প্রমাণ হোমওয়ার্কে
প্রাণ করে হাঁসফাঁস,
খাতা না দেখালে গার্জেন কল
তাহলেই সর্বনাশ।

ইংরেজির কথা কী আর বলি
শোচনীয় কনডিশন,
কানে ঢুকলেও মাথায় ঢোকে না
অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন।

সারাটা বছর বইখাতা ছেড়ে
যতই থাকি না দূরে,
পরীক্ষা কিন্তু নিয়ম করে
আসবেই ঠিক ফিরে।

কী করে বাঁচাই খেলার সময়
পড়া নিয়ে জেরবার,
পরীক্ষার দিন ঘোষণা হলেই
বেড়ে যায় ব্লাড প্রেসার।

রেজাল্ট একটু খারাপ হলেই
দু-কানেই পড়ে টান,
কেউ বোঝে না আমরা এখনও
অবোধ পোলাপান।

মনপাখি

দীপ্তপর্ণী লাহিড়ী

নবম শ্রেণি

আমি, যদি হতাম ছোট্ট নদী,
বয়ে যেতাম এ গ্রাম, সে গ্রাম,
যেদিক খুশি ঘুরতাম এঁকেবেঁকে।
আমি যদি হতাম মাছরাঙা,
নীল — সবুজে পাখনাদুটি মেলে
কাটিয়ে দিতাম সারাদিন শুধু জলের সাথে খেলে
আমি যদি হতাম সাদা মেঘ,
করতো না কেউ আমাকে মানা,
যেতাম উড়ে হাওয়ার সাথে ভেসে
থাকতো না আমার কোনো ঠিকানা।
আমি যদি হতাম একটি চাবি,
খুলে দিতাম তোমার মনের খাঁচা
উড়িয়ে দিতাম মন পাখিকে দূরে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে।

বন্ধু রবি

শ্রেয়শ্রী ঘোষ
একাদশ শ্রেণি

দেবতার পরে পূজেছি যারে
পিতা মাতা ও তোমারে।
২৫শে বৈশাখে করেছি বরণ।
পুষ্পমাল্য তার উপকরণ।

বাংলা মায়ের সন্তান তুমি, জগৎজোড়া নাম;
তুমি হলে বর্ষা দিনের সুমধুর প্রিয় গান।
তুমি রয়েছ বিদেশ ভুঁয়ে নোবেল জয়ী হয়ে,
আমি রয়েছি তোমার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে।
যে কলমে 'কর্তার ভূত'-এর ওঝা হয়েছিলে,
সেই কলমেই 'প্রেমের জোয়ারে' ভাসিয়ে তুমি দিলে।

চিত্রাঙ্গদা'-র মন কেমনে; আফ্রিকা-র জনজীবনে,
বাংলা সাহিত্যের আঙিনাতে,
তোমার পুষ্পের সুবাস ভাসে।
'গোরা' হিন্দুর জ্ঞানচক্ষু 'জনগণ' এর কবি,
'আমার সোনার বাংলা'-র গর্ব; আমার বন্ধু রবি।।

Rock Skipping

Sanket Paul,
Student

A boy had a rock
But not in the stock,
It was not an ordinary pabble
In water it can be stable.
The boy got beside a lake
He threw it as a piece of cake
The rock jumped and jumped again!
And at last it sunk in
The boy was full of joy
As he just got a new toy
The boy ran inside his home and told his mother
That the rock jumped high ad further!
She greeted the boy
The boy was recharged with joy.

অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয়নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল, সা বর্বরের আবাস ছিল, তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফিরে দেখা

বিপ্রজিৎ বিশ্বাস

দ্বাদশ শ্রেণি

এই বইয়ের একটা অধ্যায় একটু পরেই শেষ!
নতুন অধ্যায় শুরু, আগের সব ভুলেও থাকবে তার রেশ।
শুরু হয়েছিল কান্নায়, শেষ হবে কান্নাতেই।
তফাত হয়তো আছে — প্রকাশ হবে প্রথমটি, দ্বিতীয়টি অন্তরেতেই।
গল্পের পাতার সংখ্যা জানিনা, লাগেনি কখনও একঘেয়েমি।
তবু অধ্যায়ের শেষে, হয়তো জনে না কেউ - কতটা বেদনার্ত আমি!
গল্পের উত্থান-পতন-সেই সম্পর্ক ছিঁড়ে বেরোবে কে?
ভুলে যাও চরিত্রগুলো, মনে রাখো ভাববস্তুটিকে।
প্রথমের সেই কান্না বদলে গেলো হাসিতে, নিজেও জানিনা।
যাদের কাছে যেতে ভয় লাগত, এখন তাদের ছাড়তে চাইনা।
বন্ধুত্ব যেমন হয়েছে, খারাপও লেগেছে কিছু ঘটনাতে,
তবুও আজ মনে হয় ক্ষমা চাই, রাখবো না ব্যথা মনেতে।
চরিত্রদের কেউ হবে পথের দিশারী, মনের আনন্দ কাড়বে কয়েকজন,
কাউকে বাঁধবো গানের সুরে, গল্পে তারাই আপনজন।
কত না কথাই যে মনে পড়ে, সব কি বলা যায়!
সময়টা বড্ড আগে চলে গেল, চলে গেল সবই, হায়!
চরৈবেতি মন্ত্র নিয়ে নতুন অধ্যায়, চলো শুরু করি,
আগের অধ্যায়ে শিখেছি যা, তাই বানাবে নতুন তরী।
এই বইয়ের একটা অধ্যায় হয় তো এবার শেষ!
নতুন অধ্যায় শুরু, পুরোনো চলে গেলেও থাকবে তার রেশ।

'য়ুরোপিয় সভ্যতা প্রথম থেকেই নগরে সংহত হবার পথ খুঁজেছে।
নগরের মানুষের সুযোগ হয় বড়, সম্বন্ধ হয় খাটো।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার দেশ : আমার প্রাণ

ধর্মা মজুমদার
সপ্তম শ্রেণি

রক্তে ভূমির গল্প গাঁথা
রক্তে রচিত ইতিহাস পাতা,
বসন্তে আসে তার অঘ্রান,
সেটাই আমার দেশ আমার প্রাণ।

হয় আমার দেশের জন্য গর্ব
যারা শমনকে ডেকে গমন করেছেন স্বর্গ
দেশবাসী তাদের ভুলবেনা গো কভু
মনে রাখবে জনগণ মনে রাখবে প্রভু।
সকল বিঘ্ন পেরিয়ে যারা গড়েছে দেশের মান
প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বতন্ত্র-দেশ, রাখেনি অপমান।

আমার দেশে ফুলের সুবাস
আমার দেশের ধূলি
নির্মল নীল সূর্যের আকাশ
আনন্দের দুয়ার খুলি।

রক্তে ভূমির গল্প গাঁথা
রক্তে লেখা ইতিহাস পাতা,
সকলে মিলে রাখি তার মান
সেটাই আমার দেশ, আমার প্রাণ।

আমাদের দেশ

সুতনু বোস
সপ্তম শ্রেণি

যাহার কথা ভাবতে গিয়ে
বিপ্লবীদের প্রাণ হয়েছে শেষ,
সেই আমাদের সবার প্রিয়
সেই আমাদের দেশ।

যার জন্যে নিয়েছে ফাঁসি
মাস্টারদা থেকে ক্ষুদিরাম,
যাহার হয়ে লড়তে গিয়ে
ঝরেছে সবার ঘাম।

দেশের জন্যে প্রাণ নিয়েছে
গান্ধি থেকে নেতাজি,
আরও কত বিপ্লবী সব
যুদ্ধে ছিলেন রাজি।

অবশেষে সেই মঙ্গলেতে
কাটল সবার খেদ
সবার মুখে ফুটল হাসি
স্বাধীন হল দেশ।

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান আসি
অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান ?"

— কাজী নজরুল ইসলাম

বাস্তবের মূল্যবোধ

অনিক মণ্ডল
দশম শ্রেণি

বন্ধু তুমি শুনেছো কী?
আজকে রাতের খবর।
আজকে রাতে বৃষ্টি হবে,
ভিজবে সারা শহর।
ভিজবে তোমার সাধের বাগান।
ভিজবে তোমার বাড়ি।
মনের দরজা খুলে রেখ।
আমি আসতে পারি।
ক্লান্ত দিনের অসংলগ্নে।
অতীত যখন পড়বে মনে।
তখন যদি আমার কথা।
নাই বা মনে রয়।
স্মৃতিটুকু দেবে তোমায়
আমার ছোট্ট পরিচয়।।

তুমি যদি ১০০ জন মানুষকে সাহায্য করতে না পারো, তাহলে অন্তত একজনকে সাহায্য করো।

— মাদার টেরেসা

বৃদ্ধাশ্রম

রত্নদীপ সাঁতরা
একাদশ শ্রেণি

বৃষ্টি বাদলের দিনে, জানালার ধারে বসে,
টেবিলে ছেঁড়া কাগজ ও হাতে পেন নিয়ে
মাথায় কতো স্মৃতি ও হৃদয়ে বেদনা নিয়ে
লিখতে বসেছি আমার ছেলেকে নিয়ে স্মৃতি।

ছেলে আমার বড়ো আদরের,
আমেরিকার বড়ো অফিসে চাকরি করে,
সেখানেই থাকে বউকে নিয়ে।

বিদেশ যাওয়ার আগে, রেখে গেছিল আমায় এই বৃদ্ধাশ্রমে,
মাসে দু-একবার ফোনে কথা হয়,
কথা হয় কিক্ষুক্ষণের জন্য।

ছেলে আমার বড়ো ব্যস্ত, অফিসের চাপ,
তাই হয়তো দিনে মনে পড়ে না একমুহূর্তের জন্য মাকে।

নাতি নাতনিকে দেখিনি কতোদিন হয়ে গেল,
বাড়িতে এসেছে মেমসাহেব বউ, মস্ত বড় অফিসার,
দেশে এসেছিল দু-বছর আগে,
তাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার, মনে পড়েনি মাকে।
এখানে এসে পেয়েছি নিজের এক ছোট্ট পরিবার,
ছেলে বউকে নিয়ে সংসার করার ইচ্ছা আমারও করে,
কিন্তু তারা যে ব্যস্ত মানুষ,
বৃদ্ধ মায়ের কথা মনে পড়ে না তাদের একেবারে না।

বন্দীশালার অস্ত্রাগার

অর্ঘ্য সাহা
দশম শ্রেণি

বন্দীশালায় রাহুর জ্বালা
অসভ্যরা ভাঙবে তালা
সে যে নেই কো কালা,
জানিয়ে দে, —
যে বহিবে না আর বন্দীশালার অন্ধপাতে
তার জীবন এখন সিন্ধুপাড়ের,
পাহাড়তলির অগ্নিখাতে।
সে যে বংশ রবির
তোরা সব ভুলের কবি,
ভুলের কবি, ভুলের কবি।
বদলে দে সব দৃষ্টিকোন
পেয়ে যাবি যখের ধন
পাবি না কোথাও আর সেই আস্বাদন।
ছেড়ে দে জেল থেকে রে, ছেড়ে দে জেল থেকে রে
কাজে লাগা সেই শক্তিকে শুভ কাজের মন্দিরে।

বার্তা

সাগ্নিক মণ্ডল
একাদশ শ্রেণি

মানুষের নেই কোন লজ্জা,
স্থাপন করে শুধু মন্দির, মসজিদ, গির্জা।
রাত দিন কেবলই নাম করে মম।
আমি যেন নির্বোধ, নিষ্ঠুর মনুষ্য সম!
যদিনা করো কর্ম;
যদিনা ত্যজ গলদঘর্ম,
মনে রেখো, বৃথা এইসব হে নর!
কেউবা নৃমণি সেজে আছে আজ;
কেউবা তার দাসী, কেউবা দাস।
পরস্পরের সাথে কেউ আছে বিবাদে মেতে।
কেউবা বিবাদপরাঙ্মুখ। মনে রেখো
সম্প্রীতিতেই আছে শ্রেষ্ঠ সুখ - মুক্তি!
আজ, শণিত বিশ্বে তোমরাই
পারো আনতে নব দিগন্তের দিশা,
করে যাও তবে মানব সাধনা।

''যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কখনই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসেরা শক্তি চায়, অপরকে দাস বানিয়ে রাখার জন্য।

— স্বামী বিবেকানন্দ

বৃষ্টির অপেক্ষায়

ভুবন সাহা
নবম শ্রেণি

মেঘ ডাকে গুরু গুরু,
বৃষ্টি এবার হোক শুরু।

ভিজে মাটি তৈরী করার,
শপথ নেওয়ার সময় এবার।

পরিবেশকে ভরিয়ে তুলবে,
বৃষ্টি আসবে ভিজে মাটির গন্ধ নিয়ে।

গাছের পাতা ভরিয়ে তুলবে,
বৃষ্টির বিন্দুতে।

কালো মেঘে আকাশ ঢাকবে।
থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকিয়ে
বুকের ভিতর ভরিয়ে তুলবে
নিরুপায় ভয়কে।

উড়িয়ে নিয়ে যাবে,
গাছে থাকা ঘুড়িটাকে।

পিছল মেঝেতে পিছল খেয়ে,
কোমরটা যাবে ভেঙে।

চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে,
আসবে বৃষ্টি নেমে।

পরিবেশ থাকছে তো অপেক্ষার,
কিন্তু বৃষ্টির দেখা নাই।

পরমসাথী

দীপরাজ রায়চৌধুরী
একাদশ শ্রেণি

কাক ভোরে যার হাঁকে,
অনিচ্ছাতেও চোখ খোলে।
যার আদরেই দিন শুরু হয়,
ঘুম ভাঙ্গানের শোক ভুলে।
দিনের শুরু থেকে শেষ,
আমার খেয়ালেই ব্যস্ত সে বেশ,
কখন যে কি দরকার আমার?
কিভাবে আমি ভালো থাকি
কোন রান্নায় খুশি আমি,
সবটা তার নখদর্পণে।
রাগ হলে খুব বকেন ঠিকই,
কিন্তু নিজের দুঃখগুলো চাপেন মনে,
খুব গোপনে।
আমি কিই বা করি তার প্রতি?
তবু আমায় নিয়েই পৃথিবীটা তার।
তুচ্ছ এই দীপের জ্যোতি,
যার আগুনেই জ্বলে বারবার,
সে মানুষটি, নিজের সুখ নিয়ে,
কখনোই যেন পরোয়া করেন না!
শুধু মায়ের আমি, আর তিনি?
সেই তো আমার পরমসাথী,
আমার প্রাণের স্নেহময়ী সর্বপ্রিয়া মা!

শেষ প্রান্তর

অরিত্র মণ্ডল

নবম শ্রেণি

ছোট্ট রুনু রোয়াকে বসে
খেলছিল তার আপন মনে
হঠাৎ আমায় বলে, —
'মানুষের গতি থামে কোথায় গিয়ে?'
কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর, আমি বলি
''শেষ প্রান্তরে''।।

শেষ প্রান্তর!
শেষ প্রান্তর ঃ যেখান থেকে
মানবের একটি নতুন জীবন শুরু।
একটি গতিহীন পথ —
যেখানে নেই মায়া, ক্রোধ, ত্যাগ, অন্ধকার
আছে শুধুই রোদ্দুর আর আনন্দ!

দাদুকে হারিয়েছি আমি
না, ভুল!
দাদু আমাকে হারিয়েছে!

যেতে পারিনি তার সঙ্গে সেদিন
তবে মনে আছে প্রত্যেকটি মুহূর্ত, স্মৃতি, ভালোবাসা
প্রত্যেকটি অপূর্ণ ইচ্ছা আর —
শ্রদ্ধার অভিজ্ঞতা!

আজও মনে পড়ে দাদুর পড়ানো!
অপরাধী লাগে নিজেকে
মনে হয়, কেন তখন বাহানা করে
পড়তে যেতাম না।
আজ কতদিন হয়ে গেছে, দাদু আর পড়ায় না!

মনে পড়ে সকাল বেলা
দাদুর ফোনকল —
''দাদা ..... গুড মর্ণিং, কী করছো?
আজ কী পরীক্ষা? সব তৈরি তো?

কাল আমার ফাইনাল পরীক্ষা
কিন্তু দাদু আর ফোন করবে না?

কিছু মানুষ পৃথিবীতে আসে
বাকিদেরই মতো
কিন্তু যাওয়ার সময়
ফেলে রেখে যায় অনেক স্মৃতি।

তাদেরই মধ্যে একজন আমার দাদু
শ্রদ্ধেয় শ্রী হরিশচন্দ্র মণ্ডল!

আজ নেই
কিন্তু তার স্মৃতিগুলো রেখে গেছে
তার সেই ঘরে, বিছানায়, টেবিলে, আলমারিতে,
তার সেই নিষ্প্রাণ শরীরে
যা আজও ভাসে আমার সর্বত্র।
থাকে ঘুমের মাঝে
বলে, — ''দাদা, পড়াশোনাটা করে যাও''!

> একমাত্র জ্ঞান, দয়া, প্রেম ও ভক্তি মানুষের চৈতণ্য কে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম।''
>
> — রামকৃষ্ণ দেব

বই

প্রতীতি চৌধুরী
শিক্ষিকা (খণ্ডকালীন)

একলা তুমি —
একলা আমি।
তবুও তুমি —
সবচেয়ে দামী।।
তুমি সাজো —
শত রঙে,
শত রূপে —
লোকসমাজে।
কারো কাছে —
খুবই দামী,
কারো কাছে —
একটুখানি।
গুনে তুমি সাত সমুদ্র
রূপেও তুমি রাজা
তোমার সাথে সময় দেওয়া
নয়কো - এত্ত সোজা।
সময় থেমে —
তুমিও থেমে হাতে উঠলেই —
যাও যে জমে।
হয় না তোমার কোনো তুলনা।
কোনো ডিমাণ্ড তুমি করো না।
চলার পথে —
আরও এগোতে,
চোখ মেলেছি —
দূর জগতে।
মনের ভিতর — বাড়ছ তুমি
আকাশ সমান হয়ে
স্বপ্ন সত্যির পরী সেজে
নীল আকাশে — চলছে বয়ে।

নারী

রাখী ভৌমিক
শিক্ষিকা (ভোকেশনাল বিভাগ)

আমাদের
ধর্মে কোনো মিল না থাকুক
ভাবনায় মিল আছে।
ধর্ম যতই দূরে ঠেলুক
ভাবনা আনে কাছে।।

আমরা
আধুনিক বলে, নিজেদের
যতই গর্ব করি।
প্রাচীন ভাবনা আজও মোদের
ছাড়তে নাহি পারি।।

ওরা
ধর্ম নিয়ে যতই চেঁচাক
ধর্মগোঁড়া গুলো।
সবই তো বাইরের ভেক
বাড়িয়ে আছে নুলো।।

তারা
ধর্মের ধ্বজা যতই ওড়াক
ঐ আকাশের পানে।
নজরটাতো নীচু অনেক
সদাই রেখো মনে।।

তুমি নারী - আমিও নারী
একই তো রক্ত।
সমুখ জবাব দিয়ে দিলে
তবেই হবে জব্দ।

নীড় কথা

অঞ্জন বিশ্বাস
সহ-শিক্ষক

কুহেলিকা মাখা অবিন্যস্ত চুলে
চেয়ে আছে মৃন্ময়ী এক মুখ,
মরুচোখ যেন তার নিশীথ সূর্য!
অজানা আশঙ্কায় কাঁপে বুক।
কোন্ সে দূরে এক মরুদ্যান মন
কে জানে সে কোনখানে
জীবনের সন্ধানে
দিবসে জ্বলে-পুড়ে ফেরে সারাক্ষণ!
রাতের তারারা দেয় উঁকি
দু'চোখ চেয়ে উদ্বিগ্ন মুখে,
নীড়ে ফিরি বিহঙ্গ বেশে
মাথা রাখি বনিতার বুকে।
বৃষ্টি ফোটায় চুমু দেওয়া পাখি,
রাতের কথা রাতের গভীরে
তন্দ্রা ভুলায় পাখির নীড়ে
আবরণ ছিড়ে বিবশ করে আঁখি।
সহস্র প্রতীক্ষা শেষে
তোমারে যে ভালোবেসে
অবশেষে শান্ত সে অন্তস্তল,
ক্লান্ত এই দিনের শেষে
বনিতার মুখ যেন
মরুপথে ভিস্তির মশকের জল।

সবচেয়ে সুন্দর

সায়ন্তন বিশ্বাস
শিক্ষাকর্মী

অপরূপ সুন্দর তুমি
প্রকৃতির সৃষ্টিতে
চোখে দেখে চোখ জুড়ায়
হৃদয়ের ভাবনা তে।
মুখে হাসি মন খুশি
ভাবি যদি অপরূপ সৃষ্টিতে
আরও কত সুন্দর,
যদি দেখি ফুলকে
চোখে দেখে খুশি হও মনে
ছিড়ো নাকো ফুলকে।
বিশ্বাস, উৎফুল্লে ভরা তোমার মন
তবু কেন বোঝে না এ অবুঝ মন
সৃষ্টিতে বিকল্প নেইকো তোমার
তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমিই মহান।
বিশ্ব পিতা যীশুর সমান
তুমিই সবচেয়ে সুন্দর
বৃক্ষ তোমার নাম।

"মনে রাখবে, জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো, অন্যায় ও অন্যায়ের সাথে আপোষ করা।"

— সুভাষ চন্দ্র বসু

Teacher's Day

Aditya Mondal

Class - V

When I was weak,
You supported me,
You taught me,
Well and properly
You taught me how to be —
Happy and gay,
Thanks all of you
Happy teacher's day.

পেছনে তাকিও না, শুধু সামনের দিকে তাকাও — অসীম শক্তি, অসীম উদ্দম, অসীম সাহস এবং অসীম ধৈর্য — এরা একাই পারে মহান কোনো কর্ম সম্পন্ন করতে।''

— স্বামী বিবেকানন্দ

Teacher

Sattwik Majumdar

Class - IX

A teacher is a tree,
Who donates shade for free;
A teacher is a love,
A teacher is a dove.

A teacher is a great book,
Which has a fabulous look;
A teacher is a fellow,
Who pours sea of knowledge
in a hollow.

You fail, you cry,
They are always by you for another try;
In your life race,
They desire your success.

They give you a beat or a scold,
To make your future uphold;
They are your philosophers and guides,
Who make you right.

They are our backbone,
Without them we are alone,
God in them gives us blessing,
Without them we are nothing.

Identity

Kushal Karmakar
Class - XI

I just look through the nature
Feeling now beautiful is the sky!
Perhaps I am able to see the future
Everybody will deal with the lie.
Now I can feel it, being mature
Situations have opened my eye.
But we can't accept the way of the end
They have to change the trend
Hand but we have to strike out the liar
Otherwise the hearts will contain fire
At the end you'll realise your identity
Are you also not a part of any cruelty?

Holi

Srija Saha
Class - IX

Now in spring,
Colours are dancing,
Amid the Nature
That's a wondeful feature.
Birds are singing
Children are playing,
They spray water colours,
On their elders.
In nature young leaves grow
Calm wind moves their melody
Birds sing their melody,
Nature is seen in a new body.

I love this time
When the nature sings its
melodious rhyme,
In this holy I wish everyone
Happy Holi.

যারা তোমাকে সাহায্য করেছে, তাদের কখনও ভুলে যেও না। যারা তোমাকে ভালোবাসে, তাদের কখনও ঘৃণা কোরো না। যারা তোমাকে বিশ্বাস করে, তাদের কখনও ঠকিয়ো না।''

— স্বামী বিবেকানন্দ

A Quest

Tanika Ray
Class - XI

On a gloomy day in the God's territory
There was a biz at the grocery.
Suddenly the very thirsty chaps
With killing machines in their hands,
Came there
To look for a shelter.
Seeing them the people screamed,
So did the Holy Dove and the Almighty;
But their silent screams failed to be heard.
And Their correspondent, with his heart full of honesty,
Lay sanguine on the lonely boulevard.
Time flew,
And some new plants grew;
But those chaps couldn't get
Their craved shelter yet.
So now they looked for a Holy Garden
As the flowers there are full of sweet nectar;
Listening to their proposal, their leader shouted 'Amen!'
They began walking past the Garden
With their very own breath
Smelling like death;
And they trampled over nineteen buds
In a state of intoxication from their thirst.
Still, the Almighty was too forgiving to scream.
Ah, Almighty, over whom shall you reign in a dead land?
Tell me why you always like to retrieve
The flagile flowers in your own hand.
And tell this burning soul by when, by when
Would these chaps have their thirst satisfied?
And by when would their killing machines die?
And your Garden would bloom like never before
For an unfathomable amount of time?
Tell me, prithee, tell me……

''যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন,
সে দেশের হিতসাধনে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম।''

— বিদ্যাসাগর

Best School of Life

Subir Kr Saha
Assistant Teacher

One gloomy morning I came here;
I strongly felt one day my end would come.

I was at the best school of life:
The best place to get the meaning of
'Here, where men sit and hear each other groan;
Where palsy shakes a few, sad, last grey hairs,
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies;
Where but to think is to be full of sorrow
And laden- eyed despairs;
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pines at them beyond tomorrow.'

A close friend of mine came here
Much before his time for eternal rest
After a long battle against the Emperor of all maladies.

He awaited his turn; It came;
And the mourners took him to the furnace
On a wobbly bier decked in white.

They paid him their last respects
With tears rolling down their cheeks;
The furnace stuck its tongue out
Like a hungry snake;
It devoured the mortal remains
Like a flash of lightning.

A high-pitched wail rent the air;
Some as mute as cold stone;
Some profusely eulogizing him.

Forty-five minutes passed;
And then it was done;
He returned as a handful of ash.

Why do we fight over all that
We have to leave behind
When the call comes from there?

I pondered; I sobered;
I learnt how to live and depart this life.

পিতা-মাতার সেবাই শ্রেষ্ঠ পূজা,
এবং সন্তানের প্রধান ও পবিত্রতম কর্তব্য।

— বিদ্যাসাগর

অসম্পূর্ণ ডাইরি লেখা

অভিরাজ সরকার

অষ্টম শ্রেণি

আমি সৌরভ, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সবে আমাদের গ্রীষ্মের পরীক্ষা শেষ হল। এখন গরমের ছুটি পড়ে গেছে। আমি আর আমার প্রিয় বন্ধু দীপক ঠিক করেছি এই গরমের ছুটিতে অন্তত, এক পাতা করে ডাইরি লিখব। গরমের ছুটিতে আমরা গিয়েছিলাম পুরী। জগন্নাথ দেবের দর্শনে। পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দেবের দর্শন না করা এবং সমুদ্রে স্নান না করলে যেন আমার কাছে পুরী যাওয়াই বৃথা। পুরীতে গিয়ে আমরা একটা বনভোজনের মতো করেছিলাম। সমুদ্রের টাটকা মাছ এবং সাদা ভাত ছিল বনভোজনের এর প্রধান খাবার। ছুটি শেষ হওয়ার কিছু দিন আগেই আমরা ফিরে এলাম।

এবার আসা যাক দীপকের ডাইরির দিকে। দীপক গরমের ছুটি কাটিয়েছিল নিজের মামা বাড়ী শরৎপল্লী নামক এক গ্রামে। দীপক জীবনের শেষ ক-টা দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়েছিল। একথা বলছি কারণ দীপক ও তার বাবা-মা যে দিন ফিরে আসছিল সেদিন সন্ধ্যা বেলায় একটা ফোন আসে। ফোনে একজন ভদ্রমহিলার গলার স্বর শুনতে পাওয়া গেল। তিনি বলে উঠলেন — দিদি আপনি কী সৌরভ-এর মা?

মা বলল — হ্যাঁ! কিন্তু আপনি কে?

ভদ্রমহিলা বললেন — দিদি, আমি দীপকের মা।

মা বলল — ও দিদি! আপনাদের ছুটি কাটানো কেমন হল?

দীপকের মা বলল — আর ছুটি কাটানো! দিদি আপনারা কি বিলাসপুর হাসপাতালে আসতে পারবেন একটু? আসলে আমরা যখন আসছিলাম তখন আমাদের গাড়ি দুর্ঘটনা হয়। বিলাসপুরে। রাস্তার লোকেরা আমাদের এই হাসপাতালে নিয়ে আসে।

মা বলল — আমরা এক্ষুনি আসছি।

যথারীতি আমরা অর্থাৎ আমি মা-বাবা ভাই রওনা দিলাম। কিন্তু আমাদের পৌছানোর আগেই দীপক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। দীপকের মা কেঁদে কেঁদে অস্থির এবং দীপকের বাবা (এই) শোক সামলাতে না পেরে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল। দীপকের শেষ কাজ করা হল। আসলে দীপকের নিজের বাড়ীর আত্মীয়স্বজন কেউই কাছে পিঠে থাকে না। দীপকের শেষ কাজের সময় এসেছিল। সেই সময়ই তারা সব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যায়। সেই ঘটনা আজ প্রায় ১৭ বছর হয়ে গেছে। আমি এখন কাজের সূত্রে বিলাসপুরে থাকছি। আজ বিলাসপুরে ধর্মঘট সুতরাং আজ সব কিছুই বন্ধ। আমি এখানে থাকছি একটি গেস্ট হাউসে। গেস্ট হাউসে আমি আর গেস্ট হাউসের মালিক ছাড়া আর কেউ নেই। রাতের খাবারে আছে লুচি আর আলুর দম। যেই প্রথম লুচি মুখে পুরতে যাব সেই জানালা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া এল, যেন কেউ জানলা দিয়ে আমার ঘরে এলে পর্দায় যেমন অনুভূতি হয় ঠিক তেমন। খাওয়া শেষ করে আমি হাত ধুচ্ছি তখন একটা শব্দ এল। মনে মনে ভাবলাম হয়তো জানলার পাশে রাখা ছবিটি পড়ে গেছে। ঘরে এসে দেখলাম হ্যাঁ ঠিক ছবিটা পড়ে গেছে। কিন্তু দমকা হাওয়া এতটাও শক্তিশালী ছিল না যে ছবিটাকেই ফেলে দেবে। তবে কী? চোর! কিন্তু চোরটোর আসার কোনো সুযোগই নেই। কারণ দুটি ঘর একটিতে জানলা দরজা সবই বন্ধ এবং যে জানলাটি খোলা রেখেছিলাম, সেটিতে লোহার শিক্ লাগানো ছিল। হঠাৎ দমকা হাওয়ার সাথে বৃষ্টি শুরু হল। এবার একটু একটু ভয় করছে। ভাবলাম রাতটা বই পড়েই কাটিয়েদিই। মাঝে মাঝে একটা দমকা হাওয়া আসতে থাকে। তখন হঠাৎ মনে হল আজকের দিনেই তো দীপক মারা গিয়েছিল, প্রায় ১৭ বছর আগে। মনে মনে বলতে লাগলাম দীপক তুই যদি থেকে থাকিস তবে ঈঙ্গিত দে। বল সেদিন কীভাবে তোর দুর্ঘটনা হয়েছিল। এরকম আর বেশি ভাবলাম না। বই পড়তে পড়তেই পৌনে তিনটের সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখি কোনো জায়গায় বৃষ্টির চিহ্ন মাত্র নেই। আমি নিশ্চিত যে সেটা স্বপ্ন ছিলনা। তবে কী হয়েছিল কাল রাতে?

মানুষ না ভূত

সোহম দেবনাথ

সপ্তম শ্রেণি

ঋতম বাবু একজন শিক্ষক। তিনি ইতিহাস এবং ভূগোল পড়ান। এক দিন একটি ছেলে আসে। সে বলে আমার নাম সায়ন। আমি শুনেছি আপনি খুব ভালো পড়ান। আমাকে মাস ছয়েক পড়াবেন? ঠিক আছে পড়াবো। তাহলে স্যার কত টাকা বেতন দিতে হবে? প্রতি মাসে 400 টাকা দিও। কালকে থেকে পড়াতে যাব। তোমার ঠিকানাটা দিও। আমার ঠিকানা হল চাকদহ, রবীন্দ্রনগর। তাহলে পরের দিন সন্ধ্যা ৭টার সময় যাব।

পরের দিন ঋতম বাবু যখন পড়াতে যান তখন তিনি দেখেন রাস্তাটি পুরো অন্ধকার এবং কোনো মানুষ নেই কারণ সেটা সদর রাস্তা নয় গলি পথ। তিনি পড়িয়ে ৮টা ৩০ মিনিটে বাড়ি ফেরার সময় দেখেন একটি লোক ধুতি এবং সাদা রঙের একটি পৈতে পড়ে দাড়িয়ে আছে। তাকে যখন শিক্ষক বলেন আপনি কে? তখন সে হি হি হি করে হাসতে থাকে। তিনি তাকে যাই বলে সে হি হি হি করে হাসতে থাকে। শিক্ষক মহাশয় বাড়ি গিয়ে তার পরের দিন ছাত্রটির বাবার সাথে কথা বলেন, তিনি ঋতম বাবুকে সব খুলে বলেন ''বছর তিনেক আগে একজন ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করেন।'' তারপর থেকেই তার আত্মা এখানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ঋতম বাবু ভয় না পেয়ে পরের দিন আবার সন্ধ্যা ৭টায় পড়াতে যান। তিনি কিছু দেখতে পান না। কিন্তু পড়ানো শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় তিনি আবার তাকে দেখেন। এবার ওই লোকটি বলে আমি আপনাকে ছাড়বো না। সে তাকে গলা টিপে অজ্ঞান করে ফেলে দেয়। তারপর ছাত্র'র বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় ঋতমবাবুকে দেখে, তাকে তুলে তার বাড়ি নিয়ে যান এবং তার জ্ঞান ফেরার পরে তাকে তার বাড়িতে দিয়ে আসেন। মাস্টার মশাই তাকে বলে দেন তার ছেলেকে আর পড়াবে না। বলেন আমি খুবই দুঃখিত আপনার ছেলেকে না পড়াতে পেরে। তারপর অনেক দিন চলে যায় কিন্তু সেটি কি ছিল মানুষ না ভূত? আমরা আজও জানতে পারিনি!

স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভালোবাসি তাই

দীপ্তপর্ণী লাহিড়ী

নবম শ্রেণি

মাটির তলায় চৌকোনা ছোট্ট একটি ঘর। সূর্যের আলো সেই ঘরে প্রবেশ করে না। তবে ঘরটি আলোকিত হয়ে রয়েছে, একটি মোমবাতির আলোয়। সেই হলদেটে আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে মারিয়া আর রজতকে। মারিয়ার অতলান্তিক-সাগরের মতো গভীর নীল চোখদুটি তাকিয়ে আছে রজতের দিকে। সে কথা বলছে। আর রজত নিষ্পলক স্থির উজ্জ্বল দুই চোখে দেখছে মারিয়াকে। আর মন দিয়ে শুনছে তার কথা। মারিয়া এখন স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত। মারিয়া যখনই রজতের সাথে দেখা করে সবসময়ই এই একই কথা বলে। তার ভালো লাগে সময় পেলেই এইসব স্মৃতি উদ্‌যাপন করতে। আর রজতও কখনো তার এই কথাগুলো শুনে ক্লান্ত হয় না। প্রতিবার একইরকম আগ্রহ সহকারে শোনে। মারিয়া বলে তার অতীত জীবনের কথা।

দেশ স্বাধীন হবার অনেক আগে মারিয়ার বাবা বিলেত থেকে ভারতে এসে, ছোট্ট একটি ব্যবসা শুরু করেন। তিলে তিলে মারিয়ার মা মার্গারেটের সাহায্যে ব্যবসাটা তিনি বাড়িয়ে তোলেন। এই দেশেই জন্ম হয় মারিয়ার। ইতিমধ্যেই ভারত স্বাধীনতা যুদ্ধে সফল হয়েছে। প্রায় সকল ইংরেজই দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তবে মারিয়ার বাবা পিটার এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তার ব্যবসা এতোদিনে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, এত বড়ো ব্যবসা ফেলে, দেশ ছেড়ে যেতে তিনি চাননি। মারিয়া ছোটো থেকেই এখানেই বড়ো হয়। মারিয়া ছোটো থেকেই পিটারের খুব আদরের কিন্তু যখন মারিয়ার পাঁচ বছর বয়সে নিউমোনিয়ার প্রকোপে তার মা মার্গারেটের মৃত্যু হয়। তখন থেকে এই মা মরা মেয়েটিকে তিনি চোখে হারাতে শুরু করেন। পাছে সারাদিন বাড়ি থাকলে সে মায়ের কথা ভেবে কান্নাকাটি করে তাই মারিয়াকে বাড়ির কাছেই একটি কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন। শুরু হয় মারিয়ার পড়াশোনা। স্কুলে বন্ধু বলতে বেশি কেউ ছিল না তার। বেশিরভাগই নেটিভ বাচ্চা, নেটিভদের ওই কালো চামড়া আর কালো কোঁকড়ানো চুল মারিয়ার মোটেই ভালো লাগতো না।

সময়ের সাথে সাথেই মারিয়া বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে ওঠে। যৌবন এসে করাঘাত করে তার জীবনের দরজায়। তার লম্বা সোনালী চুল আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে! তার গভীর নীল চোখের মণিদুটিতে যেন আরো গভীরতা আসে! স্বভাবতই তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে অনেক ছেলেই তাকে প্রেম নিবেদন করে। মারিয়া তাদের পাত্তা দিত না। কিন্তু হঠাৎই মারিয়ার চোখ আটকে যায় উজ্জ্বল কালো দুটি চোখে। এমন ঔজ্জ্বল্য মারিয়া আর কখনো কারোর চোখে দেখেনি। ছেলেটি ভারতীয় হিন্দু ঘরের সন্তান। কাছেই একটি প্রাইমারি স্কুলে সদ্য শিক্ষকতা শুরু করেছে। বয়স তেইশ-চব্বিশের মতো। এমনিতে সে দেখতে অতি সাধারণ, তবে তার দুই চোখে যেন আলো ঠিকরে বেরোয়। নাম রজত মৈত্র। মারিয়ার মিষ্টি স্বভাব ও রূপ দেখে তার প্রেমে না পড়া প্রায় অসম্ভব। তাই মারিয়া যখন নিজে এসে তার সাথে কথা বলা শুরু করলো, তখন রজতও নিজেকে আটকাতে পারেনি। ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক এগোতে থাকে। শুরুতে লাজুক কথা, তারপর পাশাপাশি হাঁটা, ঘনিষ্ঠ হওয়া — ভালোই চলছিল তাদের জীবন। হঠাৎই তাদের জীবনের শান্ত বিকেলগুলিতে ঘনিয়ে আসে এক কালবৈশাখী।

রজতের বাড়ি থেকে তার বিবাহের ব্যবস্থা শুরু হয়। রজত বাড়ির লোককে থামাতে না পারায় তারা সিদ্ধান্ত নেয় সম্পর্কের কথা উভয়ের বাড়িতে জানাবে। মারিয়ার বাবা কখনো তাকে কিছুতেই না করেননি। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না। রজতের ধর্মে পিটারের কিছুই এসে যায় না। মেয়ের খুশির তার কাছে শেষ কথা। কিন্তু বাঁধা দিল রজতের পরিবার। তারা তাদের পরিবারে কোনো খ্রিশ্চান মেয়েকে

মেনে নিতে রাজি নন। ফলে শুরু হয় সমস্যা। পরবর্তীতে সমস্যা এতটাই বেড়ে ওঠে যে রজতের পক্ষে তার পরিবার ও মারিয়া, দুটি সম্পর্ক একসাথে সক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মারিয়ার বিশ্বাস ছিল, যদি রজতকে পরিবার ত্যাগও করতে হয় তবুও সে মারিয়াকে ছাড়বে না। কিন্তু তার সেই আশা ভরসায় জল ঢেলে রজত তার পরিবারকে বেছে নেয়। মারিয়ার সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে, সে পরিবারের সকলের পছন্দের পাত্রীর সাথে বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। অবশ্য সে বিয়ে তার আর করা হয়নি।

বিবাহের তিন দিন পূর্বেই রজত নিখোঁজ হয়ে যায়। তার বাড়িতে পুলিশ আসে। রজতের বাবা সন্দেহ প্রকাশ করায় পুলিশ মারিয়ার বাড়িতেও হানা দেয়। তবে তাতে মারিয়ার আরও দুফোঁটা অশ্রুবিসর্জন ছাড়া আর কিছুই ফল হয়নি। প্রমাণের অভাব, পিটারের অর্থের দাপট, আর ঘুষের লোভে পুলিশ সেদিন বাড়ি সার্চ না করেই ফিরে যায়। মারিয়ার খুব চিন্তা হচ্ছিল কারণ রজত তো তার বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল।

রজতের বিবাহের সংবাদে, মারিয়া যখন দুঃখে দুই দিন দরজা বন্ধ করে, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে ঘরের ভিতর অবিশ্রান্ত কাঁদছিল, তখন মেয়ের দুঃখ সহ্য না করতে পেরে পিটার রজতকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে। রজতও মারিয়ার অবস্থা শুনে তাকে উপেক্ষা করতে পারেনি, পিটারের সাথে সে চলে আসে মারিয়ার বাড়ি। তারপর সে আর কখনও ফিরে যায়নি।

বিগত যাট বছর রজত এখানেই আছে। এত বছরে মারিয়ার শরীরে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তার দুধ সাদা চামড়া বয়সের ভারে ঝুলে পড়েছে। তার সোনালী চুল আস্তে আস্তে রূপালী রং ধারণ করেছে। কিন্তু রজত একটুও পাল্টায়নি। তার উজ্জ্বল চোখের চাহনি এখনও একই আছে। শুধু সে আর কথা বলেনা। তাতে অবশ্য মারিয়ার কোনো আফশোস নেই। শুধু রজত তার কথা শুনলেই যথেষ্ট। তার দিকে তাকিয়ে থাকলেই সে খুশি! তাইতো যখন মারিয়ার বাবা মারিয়াকে রজতের মৃতদেহ এনে দেয়, তখন সে তার চোখদুটি খুলে কোটরে সেলাই করে, অ্যালকোহল পূর্ণ কাঁচের বাক্সের ভিতর তাকে অমর করে রেখেছে।

— রজত মারিয়াকে ছেড়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু মারিয়া তাকে যেতে দেয়নি!

— কেন?

কেউ যদি এখন মারিয়াকে এই প্রশ্নটি করে, তবে মারিয়া উত্তরে একটু মুচকি হেসে বলে, ''ভালোবাসি তাই।'' —

যে মানুষ বলে — তার আর শেখার কিছু নেই সে আসলে মরতে বসেছে। যত দিন বেঁচে আছো — শিখতে থাকো।''

— স্বামী বিবেকানন্দ

মানুষের মৃত্যু আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মৃত্যু দেখিলে।

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ক্যামেরা

প্রিয়াস বণিক

দশম শ্রেণি

পুনের হাসপালের ICU-তে তিনদিন পর যখন তৃষার জ্ঞান ফিরল তখন সবার প্রথম সে তার মাকে দেখতে পেল এবং তার অন্যপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তার বাবা। দুজনের চোখে খুশির সাথে সাথে অন্য কিছুও দেখতে পেল সে। ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে সে বলল 'পরি কোথায়'। কিছু না বলে তাঁর মা তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকল। কিন্তু তৃষার চিৎকার ''পরি কোথায়''? কোথায় পরি? কিছুতো বলো — পরি কোথায়? কোন উত্তর না পেয়ে সে বুঝল পরি আর এই পৃথিবীতে নেই। তৃষা আর পরি ছিল দুই বোন। তারা ট্রেকিং খুব পছন্দ করত। তারা একে অপরকে সব সময় চ্যালেঞ্জ করত। দুজনে সব বিষয়ে ছিল প্রতিযোগিতা। তারা একে অপরকে ভেঙাত আর বলত 'যে হারে সে মরে'।

একবার তৃষা ও পরি পাহাড়ে উঠার সময় তৃষার পা পিছলে গেল তাকে ধরার জন্য পরিও পড়ে গেল। এরপর তৃষার আর কিছু মনে ছিলনা। পুলিশ পরির মৃতদেহ ট্রেকিং এলাকার মধ্যে খুঁজে পেল।

তৃষার একটি রহস্য ছিল যা সে কখনও কাউকে বলেনি। জ্ঞান ফেরার পর সে পরির আওয়াজ শুনতে পেল, আশ্চর্য সে সেই আওয়াজ আর কেউই উপলব্ধি করতে পারল না। পরির উপস্থিতি সে সবসময় অনুভব করত। তৃষা শুনতে পেত তার পরি কখনও হাসছে আবার কখনও কাঁদছে কখনও বলত ''যে হারে সে মরে''। তৃষা অস্থির হয়ে যেত। একদিন সে ছুটে চলে গেল সেই অভিশপ্ত ট্রেকিং এলাকায়। যেখানে তৃষা তাঁর বোন পরিকে চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলেছে। সেখানে গিয়ে তৃষা পরির কথা ভাবতে ভাবতে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা নেমে এল, এমন সময় তৃষার চোখ পড়ল পরির প্রিয় ক্যামেরার উপর। তৃষা ক্যামেরাটি পেয়ে একটু স্বস্তি অনুভব করল। সে পরির ক্যামেরাটি নিজের কাছেই রাখত। তৃষা ভাবত যে পরি তার কাছেই আছে।

কলেজ জীবন আবার শুরু হল, তৃষা ক্যামেরাকে তার কাছ ছাড়া করত না। হঠাৎ একসময় তৃষার অদ্ভুত এক শখ জন্মাল। তার শখ, ভয়ংকর দৃশ্যের সব ছবি তোলা। কখনও Science ক্লাসে ব্যবহার করা মৃতদেহের ছবি তোলা কখনও মানুষের হাড়, পশুর ছেঁড়া কাটা মৃতদেহ; আবার কখনও মাঝরাতের অন্ধকারে সে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়ত ছবি তুলতে। এই অদ্ভুত শখের জন্য তার বাবা-মার খুব চিন্তা হত। তাই তৃষা কিছুদিনের জন্য বাড়িতে এসেছিল বাবা-মাকে বোঝাতে যে এতে তার কোন ক্ষতি হবে না এবং ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

এরপর তৃষা হোস্টেলে চলে গেল। কয়েক মাস পর একদিন রাতের বেলায় মাঝ রাস্তায় তৃষার ট্যাক্সিটা খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ ড্রাইভার কোথায় চলে গেল। ছবি তোলার জন্য তৃষা ক্যামেরা নিয়ে বেরল সে বুঝতে পারল যে তার গাড়ি ওই ট্রেকিং এলাকায় খারাপ হয়েছে। তৃষা একটি আওয়াজ শুনতে পেল — ''যে হারে সে মরে''। তৃষা সেই আওয়াজকে অনুসর করতে করতে গভীর পার্বত্য জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। এরপর থেকে তৃষার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কিছুদিন পর তৃষার বাবা সেই ক্যামেরাটির সন্ধান পেলেন। তার সঙ্গে হোস্টেলে গিয়ে একটি বাক্স ও কিছু জিনিসপত্র যেগুলি তৃষা ব্যবহার করত সেগুলি বাড়িতে নিয়ে এলেন। তৃষার বাবা যে বাক্সে তৃষার তোলা কিছু অদ্ভুত ছবি দেখতে পেলেন। তার ভয় আরও বাড়তে লাগল কারণ তৃষার তোলা সব ছবিতে ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তার ছোটো মেয়ে পরি। বাক্সের শেষ ছবিটি দেখে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ছবিতে তৃষা তার ছোট বোন পরির কাঁটা ছেড়া বডির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিল। ছবিটির পিছনে লেখা ছিল ''যে হারে সে মরে''।

এককথায় প্রকাশ

উজান দাস

সপ্তম শ্রেণি

স্কুলের অন্যতম ফাজিল ছেলে, আবির। ফাজলামোর জন্য স্কুলে তার খ্যাতি কম নয়। যদিও আপাতত বাড়িতে বসেই দিন কাটাতে হচ্ছে। একমাসের জন্য তাকে সাসপেণ্ড বা বরখাস্ত করা হয়েছে। চলুন করাণটা জানা যাক .....

ঘটনাটা খুব বেশী দিন আগের নয়। সেকেণ্ড পিরিয়ড, নারায়ণ কবিরাজ স্যারের ব্যাকরণ ক্লাস। স্যার এলেন। ছাত্ররা দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল এবং স্যার গম্ভীর গলায় বলে — উঠলেন ''গুড মর্ণিং, সিট আপ''। হ্যাঁ, ঠিকই শুনলেন, 'সিট ডাউন' নয়, 'সিট আপ'। আসলে সিট আপ' বলাটা নারায়ণ বাবুর অভ্যাস। যাই হোক আজ স্যার 'এক কথায় প্রকাশ' পড়াবেন। তো পড়াতে পড়াতেই স্যার প্রসঙ্গত বলে উঠলেন যে যার আগমনে কোনো তিথি নেই তাকেই নাকি বলে অতিথি। শুনে আবিরের মাথায় একটা জিনিস এল। 'স্যার!' বলে সে ডাকল। স্যার বললেন ''হ্যাঁ বলো'', স্যার যার আগমনের নির্দিষ্ট তিথি নেই, সে যদি অতিথি হয়, তবে চোরও তো অতিথি'' স্যার একটু ইতস্তত হয়েই বললেন যে ''হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছ বটে''। আবির বলল ''স্যার মায়ের মুখে শুনেছি যে অতিথি নাকি নারায়ণ''। 'হ্যাঁ ঠিক' স্যার বললেন। আবির বলল — ''স্যার তাহলে কি ....'' ''হ্যাঁ, তাহলে কি বলো'' ''তাহলে কি স্যার আপনি চোর?'' বলতেই সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল। নারায়ণ বাবুতো রাগে লাল। ডিরেক্ট সাসপেনশন! আর বাকিটা আবিরের অশুভ ভবিষ্যৎ!

যে ব্যক্তি কোন স্বার্থ ছাড়াই অন্যের জন্য কাজ করেন,
ঈশ্বর তার সর্বদাই মঙ্গল করে থাকেন।''

— রামকৃষ্ণ দেব

''হিন্দু না ওরা মুসলিম এই জিজ্ঞাসে কোন জন, হে কাণ্ডারি বল ডুবিছে
মানুষ সন্তান মোর মা'র''

— কাজী নজরুল ইসলাম

মুক্ত বিহঙ্গ

অভিপ্সিতা মিত্র

ষষ্ঠ শ্রেণি

আমাদের একটা ছোট বাগান আছে। সেই বাগানে আছে রকমারি গাছ-পালা। যাতে অনেক রকম রঙিন ফুল ফোটে, যার সুগন্ধে আমাদের সারা বাড়ি সবসময় মেতে থাকে। এই বাগান-ই আমার খেলার জগৎ। সেই বাগানে অনেক প্রজাপতি, পাখি ফুলের মধু খেতে আসে। আমি আমার অবসর সময় এদের সঙ্গে কাটাতে খুব পছন্দ করি। আমার ছোট বেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই বাগানে। তেমন-ই এক স্মৃতি আজ তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি।

তখন আমি খুব ছোট। প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের সেই বাগানের একটি শিউলি ফুল গাছের ডালে একটি বুলবুলি পাখি বাসা বেঁধেছিল। আমি রোজ ঘুম থেকে উঠেই এবং স্কুল যাওয়ার আগে ও স্কুল থেকে এসেই বাসাটিকে দেখতে ছুটে চলে যেতাম বাগানে। একদিন দেখি বাসাটিতে দুটি মার্বেলের মতো ছোট ছোট ডিম। সাদার মধ্যে লাল রঙের ছিট্‌ছিট্। কী সুন্দর দেখতে! আমার মনটা খুশিতে ভরে গেল। সেই মা পাখি ও আমার দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর একদিন দেখি ডিম ফুটে ছোট দুটি ছানা হয়েছে। আমি ছানা দুটির কাছে গেলেই ওরা হা করে 'চিক্‌চিক্' করে ডাকত। তারা ভাবত তাদের মা তাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে।

কিছু দিন খুব আনন্দের মধ্যে দিয়েই দিনগুলো কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন বিকেল বেলা চারিদিক অন্ধকার করে ঝড়-বৃষ্টি এল। ঝড় শুরু হতে না হতেই সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেল। আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। ঝড়ের দাপট একটু কমতেই টর্চ নিয়ে ছুটে চলে গেলাম, বাগানে গিয়ে দেখি সব গাছ-পালার ডাল ভেঙে চারিদিকে লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা। ছানা দুটো গাছের নিচে পড়ে আছে তাদের বাসা সমেত। আমি কাঁদতে কাঁদতে তাদের আমার ঘরে নিয়ে এলাম। তাদের গায়ের জল মুছে দিলাম। অনেক কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু ওরা কিচ্ছু খেলো না। পরের দিন সকালে ছানাদুটিকে আবার রেখে এলাম সেই গাছের ডালে। দেখি সেই মা পাখি সেই খানেই বসে আছে। বাচ্চাদের দেখে সে ওড়াউড়ি শুরু করল। যেন সে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল। আস্তে আস্তে ছানা দুটি বড়ো হলো, তাদের চোখ ফুঁটলো, গায়ে পালক গজালো, ছোটছোট ডানা তৈরী হলো।

খুব আনন্দের সঙ্গে দিনগুলি অতিবাহিত হলেও, একদিন স্কুল থেকে এসে দেখি, বাচ্চা পাখি দুটিও নেই, আর মা পাখিও নেই, খালি পড়ে আছে বাসাটি। দেখে আমি খুব কাঁদতে লাগলাম। মা, ঠাম্মা দুজনে মিলে আমাকে অনেক আদর করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কান্না থামালেন।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো, মা বুলবুলি পাখিটির কিচির মিচির ডাকে। আমার জানালার কাছে ঝুল-বারান্দায় ও খেলা করছিল। আমি যেতেই পাখিটি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলো। দেখি একটা সাদা গোল মতো জিনিস পড়ে আছে। ওটা তুলে নিয়ে মাকে দেখাতে; মা অবাক হয়ে বলল, 'কোথা থেকে পেলি এটা'? মনে তো হচ্ছে এটা 'মুক্তো'! দাদু পাশে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিলেন। তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'যত্ন করে তুলে রাখো মুক্তোটি, পাখিটি তোমায় উপহার স্বরূপ ঐটি দিয়েছে।'

আজও মুক্তোটি সযত্নে তুলে রেখেছি আমি! তোমরা দেখতে চইলে অবশ্যই দেখাবো!

A Strange Place

Simantini Sarkar

Class - VI

One day I was coming from my school. Ragularly I see an old house but I don't find any door on it. That day I saw a door on it. I went into it. But a strange thing that when I try to open the door, it opened easily when I went into it the door vanished. I was very scared. Then I saw a shadow of a person. I followed it. It took me to a big room. Then I saw a doll. Suddenly anyone gave a hand on my back, when I turned back there was a bad faced woman. I ran fast but I couldn't find any door. I found a window. I broke it with my pencil box and came out from the house. Then I went to my house. I told all these to my family. Then my mother told me, that few years ago a family was lived there. There were 4 persons in that family. The husband, wife and the husband's parents. The husband and his parents didn't like her. One day the husband and his parents planned and killed the wife by giving acid on her body. And they left that house. After someday we found her deadbody. After six months a family was came in that house but the soul of the woman didn't live them in that house. After this incident anyone can't live there. After hearing his I never go to school by that street.

The Ant and The Grasshopper

Sarthak Bhale

Class - V

One day an ant was going to his Grandmother's house. After two hours of walking he met an old grasshopper. The grasshopper asked the ant "Where are you going for." The ant said "I am going to my grand mother's house." The grasshopper said "please take me to your grand mother's house." The ant replied "I cant take you with me because after two miles. There is a big frog. The grasshopper said "Why are you going there? he will eat you", "he is my friend he will not eat me But, he will eat you because you are not his friend." Then the ant again started walking. After two miles the ant reached the big frog. When the frog saw the ant it started crawling and said "What a good day it is an ant came by it self to his predator." The ant was very afraid and said "I am not your prey please let me go." The frog became very angry and said "I will not let you go little ant you are my lunch." Then the frog ate the ant.

জিনিয়া

তৃণা ভট্টাচার্য্য
শিক্ষিকা (খণ্ডকালীন)

চেয়ারটা সস্তায় পেয়ে গেলাম। মিত্রদার পুরোনো জিনিসের দোকানে আমার বহুদিনের যাতায়াত। আজ অফিস ফেরত ঢুঁ মারতেই এটা চোখে পড়লো। ব্রিটিশ আমলে এক চা বাগানের ম্যানেজারের চেয়ার ছিল নাকি এটা। মেহগনি কাঠের চেয়ারে সূক্ষ্ম বাটালির কাজ। এ জিনিস এখন আর হয়না। দামটা একটু বেশী পড়লেও আমার সংগ্রহে রাখার মতো জিনিস।

আমার বাড়ির একতলাটা একটা ছোটোখাটো মিউজিয়াম প্রায়। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের কলমদানি থেকে দেওয়াল সজ্জা। একা থাকি। বাবা প্রচুর পয়সা রেখে গেছেন। আমিও ঈশ্বরের আশীর্বাদে ভালই রোজগার করি। তাই এসবে খরচ করতে অসুবিধা নেই। সমস্যা হয়ে যায় নবীনের। ও বলতে ভুলে গেছি। নবীন আমার সবসময়ের কাজ করার লোক। ওই সব পরিষ্কার করে রাখে। আজকাল নতুন জিনিস আসলেই গজগজ করতে থাকে। কাজ বাড়ে তো তাই।

এখন রাত দুটো বেজে ষোলো মিনিট। আমার চোখে ঘুম নেই। আমি জানি আর চার মিনিট পরেই শুরু হবে। ঠিক যেমন চলছে শেষ তিনদিন ধরে।

নবীন আজকাল আর সকালে উঠতে পারে না। আমি জানি কারণটা। রাত ঠিক দুটো কুড়ি মিনিটে নবীন ওই চেয়ারটাতে বসে আর ক্রমাগত ব্রিটিশ ইংরেজিতে কথা বলতে থাকে। আমি জানি ওটা নবীন নয়। কিন্তু ওটা কে সেটা জানার সাহস হয়নি।

আমি চেয়ারটা ফেলে দেবো। আর পারছিনা। রোজ রাতে এক উৎকণ্ঠা, সারারাত এক ধরা গলার সাহেবের দুর্বোধ্য কথোপকথন।

নবীনকে কোনোভাবে আজ ছুটি দিয়ে ওর ভাগ্নের বাড়ি পাঠিয়েছি। আমি দেখতে চাই নবীন না থাকলে কী হয়। দুটো কুড়ি বাজে। চেয়ারে একটা খটখট আওয়াজ। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি বৈঠকখানায় চেয়ারটার দিকে দেওয়ালে এক অপার্থিব ছায়া। ঠিক যেন চেয়ারে একজন মানুষ আর তার পায়ের কাছে একটা কুকুর। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। চেয়ারটা হাত দিয়ে ধরতেই কুকুরের ছায়াটা লাফিয়ে এলো আমার গলা লক্ষ্য করে। তারপর আর কিছু নেই। আমি ফিরে আসছি আমার ঘরে একবার পিছন ফিরে দেখলাম। দেওয়ালে একটা ছায়া। একটা পুরুষের ছায়া দেওয়ালে আটকে আছে। অবয়বটা ঠিক আমার মত। গলার কাছে রক্ত নেই কিন্তু একটা তীব্র ব্যথা।

আমি রোজ রাতে চেয়ারটাতে বসি। জিনিয়া মানে আমার কুকুরটাকে শাসন করি। অপেক্ষা করি আর কেউ যেদিন এই চেয়ারটা রাত দুটো কুড়িতে ধরবে। আমার মুক্তি হবে সেদিন।

রামলালের আত্মকথা

ঋষিকা বিশ্বাস

সপ্তম শ্রেণি

ওহে বালক, দেওয়ালে এঁকে আমায় নোংরা কোরো না। এসো, তোমাকে আমার গল্প বলি।

দেখতে দেখতে ১০০ বছর কেটে গেল। আমি চাকদহ রামলাল একাডেমি নাম পাই, ১৯০৭ সালের ১লা আগস্ট। এর আগে বহুবার আমার নাম ও স্থান পরিবর্তন হয়।

১৯ শতকে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ঘুরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছিলেন শিক্ষা প্রসারের জন্য, তখন তিনি চাকদহ-তে কেরানী স্কুল নামে আমায় স্থাপিত করেন, সুখসাগর রোডে-এর কাছে। ১৮৬৬ সালে আমি হই মিডিল ইংলিশ স্কুল ও পরবর্তীতে ১৮৯০ সালে বেণীমাধব ইন্সটিটিউশন। কিছুদিন পরই শুরু হল গঙ্গার ভাঙন। ফলে সুখসাগর রোড থেকে হই উদ্বাস্তু। তারপর এই জায়গাতে পুনরায় নির্মিত করা হয়। নির্মাণ কার্যে তখনকার জমিদার রামলাল সিংহ দশ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁর দানকে স্মরণীয় রাখার জন্য ১৯০৭ সালের ১লা আগস্ট আমার নাম হয় চাকদহ রামলাল একাডেমি। তখন শুধু বালকেরাই এখানে পড়ত।

১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠা হলেও আমি সরকারি স্বীকৃতি পাই ১৯১০ সালে। তখন আমার মাঠ ছিল না, তাই বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো না কিন্তু ১৯৪০ সালে যশড়া মাঠে প্রথম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫২ সালে প্রথম রাষ্ট্রীয় ভাষা প্রশিক্ষণ-এর বিভাগ শুরু করা হয়। নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ১৯৫৩ সালে রামলাল গার্লস নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে বিদ্যালয়টির নাম হয় বসন্ত কুমারী বালিকা বিদ্যাপীঠ।

তালতলাতে আমার দ্বিতীয় গৃহ নির্মাণ-এর কাজ শুরু হল ও ১৯৫৭ সালে নির্মাণ কার্যের সমাপ্তি হয়।

আমার প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯২০ সালে আমি সরকারি অনুদান পাই। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সময় আমি জনপ্রিয় হয়ে যাই। আমার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫৫ সাল থেকে পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়। আমার রূপকার হিসাবে স্বর্গীয় প্রধান শিক্ষক আনন্দমোহন মণ্ডল মহাশয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এখন আমার প্রধান শিক্ষক হলেন ড. রিপন পাল। আমার নাম এই ২০২৩ সালে সবাই জানে। আমার দুটি শাখার প্রত্যেকটিতে ২৫টি করে ঘর আছে ও ৪৭জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন। আমার কাছে মাঠ, সুইমিং পুল, মঞ্চ সবই আছে। বালক ও বালিকা উভয়েই এখানে পড়ে। আমি ইংলিশ মাধ্যমেও আছি। আমি সেই ১৯ শতাব্দীর ছোট্ট বিদ্যালয়, এখন ২১৯৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয়। আমার ঐতিহ্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে মিলেই রক্ষা করে।

প্রাক্তন

ইন্দ্রনীল মণ্ডল

(বর্তমান বছরের উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র)

এখনো রোজ সকালে উঠে মনে হয় সেই দিনগুলোর কথা। টিউশন থেকে ফিরে কোনো রকমে স্নান করে নিয়ে খেয়েই স্কুলে দৌড়ানো। ওই যদি ১৫ মিনিট আগে যাওয়া যায় তবে একটু খেলা হবে। এখন ডিজিটাল যুগে মাঠে খেলাধূলার অবসর খুবই কম। আমার ক্ষেত্রে প্রায় ছিল না বললেই চলে। পড়া ছাড়া মোবাইলে ডুবে থাকতেই চাইতো মন, তাই ওই মাঠে খেলাটা শুধু হতো স্কুলেই। তখন এত Sun স্ট্রোক, dehydration এসবের ভয়ও ছিলনা। খোলা মাঠে প্রচণ্ড রোদে ছুটে চলত কয়েকটা দামাল ছেলে। গরমে ঘেমে জামা ভিজিয়ে শুরু করতাম ক্লাস। প্রায় অনেক দিন হয়ে গেল সেই মাঠে আর খেলা হয় না, দেখা হয়না সেই নীলরঙের building টাকে, সময় কাটানো 25 নম্বর ঘরের সামনে করিডোরে। ক্লাস 9-এর পরেই আমি চলে এসেছিলাম station building এ। এটি আবার একদম আলাদা, খোলা মাঠ থেকে এসে পড়েছিলাম একটা ইট-পাথরের দেওয়ালের মাঝে। তাই তালতলাকে খুব মিস করতাম তখন থেকেই, কিন্তু ঐযে কথায় আছে ''নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো' তখন আস্তে আস্তে এই ইট পাথরের দেওয়ালগুলোই নতুন বন্ধু হয়ে উঠলো। কত কত সময় যে ওই chemistry lab এর সামনে কেটেছে তার কোনো হিসাব নেই, সেই সময়গুলোর কথা মনে পড়লেই নিজের অজান্তেই ঠোটের কোনে মুচকি হাসি চলে আসে। তাই খুব মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা, হয়তো আর কোনদিনই ক্লাসের মাঝে লুকিয়ে প্র্যাক্টিক্যাল লেখা হবে না, হবে না সেই ক্লাসের মজা খুনসুটি, আর হয়তো কোনোদিনই ঘামে ভিজে জামা পরে ক্লাস করা হবে না, হবে না lab-এ গিয়ে Sir দের সাথে গল্প করা। খুব মনে পড়ে সেই Physics lab, ফাঁকা ক্লাস থাকলেই চলে যেতাম একটু সময় কাটাতে, কতদিন তো ক্লাস ছুটি এর পরেও গিয়েছি। হয়তো সামনে আরো অনেক ভালো ভালো ল্যাবএ যাবো কিন্তু ওই দিনগুলো কখনো ভুলবো না।

আবার কিছু Sir এর কথাও খুব মনে পড়ে যেমন মিলন Sir এর। তালতলা building, সম্ভবত ক্লাস 7-এ পড়ি মিলন Sir প্রথমবার আমার ক্লাসে এসেছিলেন, পেছনের বেঞ্চে আমি, সান্নিভ আর দেবরঞ্জন গল্প করছিলাম, Sir পড়াতে পড়াতে এলেন আর আমাদের ক্লাস থেকে বরে করে দিলেন, আর বললেন ''কোনোদিনও তোদের আমি পড়াবোনা'' ঠিক মনে নেই তবে এমনই কিছু বলেছিলেন বোধহয়। হয়তো সেদিন একটু বেশিই রেগে ছিলেন, তবে সেদিন তো কচি মনে অনেক খারাপ ধরণাই হয়েছিল Sir এর প্রতি, কিন্তু স্কুল জীবন শেষ হতে হতে নিজের অজান্তেই সেই Sir-ই আমার অন্যতম প্রিয় Sir হয়ে উঠবে সেটা কোনোভাবেই ধারণা হয়নি। আরও একজন Sir এর কথা খুব মনে পড়ে, গোপাল Sir। সেই ক্লাস 6 থেকে ক্লাস 12 Sir-এর সাথে যে কত জায়গায় গিয়েছি quiz করতে তার কোনো হিসাব নেই, কম করে 20টা তো হবেই। তার মধ্যে অধিকাংশ পুরস্কারও এনেছি স্কুল-এর জন্য, তবে পুরস্কার এর থেকেই বেশি স্মৃতি।

Sir দের সাথে এখনো কথা হয়, ভবিষ্যতেও যোগাযোগ থাকবে। খুব মনে পড়ে ওই ক্লাসরুম গুলোর কথা, ল্যাব, টিফিন পিরিয়ড, Library, করিডোর, সর্বোপরি রামলাল অ্যাকাডেমিকে। খুব খারাপ লাগে আর কোনোদিনই ফিরে যাওয়া হবে না ওই ক্লাস রুমগুলোতে, পড়া হবে না ওই সাদা কালো ড্রেস। হবেনা আর কোনোদিনও রামলালের হয়ে quiz এ অংশগ্রহণ করা। কারণ এখন তো আমি প্রাক্তন, হ্যাঁ, বলতে কষ্ট হলেও কালের নিয়মে আজ আমি প্রাক্তন। পড়াশোনার চাপে, প্রতিযোগিতায় লড়াই করতে করতে বুঝলামই না যে কবে ''রামলালের ছাত্র'' থেকে প্রাক্তন হয়ে গেছি।

তুমি কত সুন্দর

অর্কদেব বোস

দশম শ্রেণি

''একদিন নদী তটে
হরিণ ময়ূরের সনে আমি একেলা''

আজ হয়তো আমার জীবনের সবচেয়ে স্নিগ্ধতম দিন। এরূপ সৌন্দর্য, এরূপ মাধুর্য, এরূপ স্নিগ্ধতা দেখে মনে হয় এই পৃথিবীতে জন্মে কোনো ভুল করিনি। যে পৃথিবীতে মানবতা নেই, আছে শুধু হিংস্র যে পৃথিবীতে ভালোবাসা নেই, আছে শুধু হানাহানির মানসিকতা সেই পৃথিবীতে এরূপ শান্তি এরূপ মাধুর্যও যে আমি লাভ করতে পারি সেটা কখনও ভাবতে পারিনি।

বসে আছি এক নদী তটে, এক অপরূপ বৃক্ষের তলে। বয়ে যাওয়া এই নদীর নাম জানি না, তবে মনে হয় এযেন গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর মতো পবিত্র। শীতল স্বচ্ছ এই নদীর জল কেবল আমার তৃষ্ণাই মেটায়নি, মিটিয়েছে আমার মনের অশান্তিকেও। সেই বৃক্ষ যে আমাকে আমার এই ক্লান্ত দেহকে শয়নের অবকাশ দিয়েছে। চারিদিকে এক স্বর্গীয় সুগন্ধ।

মনে হয় যেন আমি চলে গেছি বাল্মীকি রামায়ণের তপবনে। দূরে একরাশি গুল্মগুচ্ছ তারই পশ্চাতে পর্বতসমূহ। যেন মনে হয় প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য ও বৈচিত্রকে একত্রিত করে এক নাট্যমঞ্চ তৈরী করেছে।

এখন বিকেলের শেষ, সন্ধ্যা হব হব করছে। একই আকাশ সূর্য ও চাঁদ। যেন দুই প্রিয় বন্ধু পরস্পরের বন্ধুত্বের প্রমাণ দিচ্ছে সমগ্র জগৎকে কিংবা আমাকে। ভেসে যেতে ইচ্ছা করছে, বিলীন হয়ে যেতে, ইচ্ছা করছে — ইচ্ছা করছে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের প্রেমে উন্মাদ হয়ে যেতে।

দেখা যাচ্ছে সেই স্পষ্ট সপ্তর্ষি মণ্ডলকে। যেন মনে হয় প্রতিটি ঋষিই আমাকে আর্শীবাদ করছে। যেন বলছে, ''হে বৎস — দেখো, দেখো তুমি কে — এই পরমাত্মার এই চিত্র শিল্পে যেন রঙের একটি বিন্দু বা তার চেয়েও তুচ্ছ।'' হ্যাঁ সত্যি, আমি নিজেও তা মনে করি। কেবল কিছু মুহূর্ত যে আমার সম্পূর্ণ জীবনের সত্যকে তুলে ধরতে পারে তা কখনও ভাবতে পারিনি।

কিছু পাখি দেখা যাচ্ছে। মনে হয় যেন এক পরিবার, যেন একত্রিত হয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছে — ''দেখো তুমি একা, কী পেলে তুমি জীবনে?'' পেয়েছি — চিৎকার করে আমার মন বলে ওঠে। পেয়েছি এই কয়েক প্রহরের নৈসর্গিক মুহূর্তকে।

'হাতে এক পুষ্প ধরিয়া বসিয়া আছি।' ঘ্রাণ গ্রহণ করছি। এই ঘ্রাণ যেন আমার মনের সব সুধাকে ব্যক্ত করে দিয়েছে। এই মুহূর্ত আমি ভুলতে পারবো না — কখনও না।

আকাশের রঙ লাল ও নীল। একদিকে লাল রঙ যেভাবে আমাকে বেঁচে থাকতে উৎসাহিত করছে অন্যদিকে নীল রং আমাকে যোগান দিয়েছে শান্তি ও প্রেম। সেই পর্বত যেন আমাকে শেখাচ্ছে মাথা উঁচু করে

বাঁচতে। মনে হয় সে যেন আমাকে বলছে এই পৃথিবীতে সব কিছুই বিধাতার সৃষ্টি। কেউ ছোটো না কেউ বড় না। একাধারে মনে পড়ছে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের কথাকে, ''এই পৃথিবীতে যা ঘটেছে, যা ঘটছে ও যা ঘটবে — সব কিছুর জন্যই আমি দায়ী।'' আবার মনে পড়ছে Ralph Waldo Emerson এর বিখ্যাত উক্তিটি — "All is well and wisely put."

দূরে এক রাশি পুষ্প। তারই পাশে ফুলের বীজ খাচ্ছে এক ময়ূর। সমগ্র প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দরতম প্রাণী এই পাখিটি। তার পেখমের সৌন্দর্য যেন অভিভূত করেছে আমার হৃদয়কে। চারিদিকে বইছে বায়ু। শীতল - শান্ত ও শুদ্ধ বায়ু। এই বহমান বায়ু যেন আমাকে বলছে যে জীবনও বহমান। মনটা খারাপ হয়ে গেল। একদিন কি এই পৃথিবী ছেড়ে আমায় চলে যেতে হবে। ছেড়ে দিতে হবে এই মায়াবী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে। তখন আমার মনে এক চেতনা জেগে ওঠে — হয়তো পর জন্মে আমার কোনো জীবরূপে জন্মে এই সৌন্দর্যের এক বৃহৎ অংশ হতে পারব। বুঝতে পারি খাওয়া ও ঘুমোনোই জীবন নয় — প্রকৃতির সৃষ্টিও তার প্রতিটি বিষয়ের অর্থ বোঝাই জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য।

সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। তবে আমাকে তা পূরণ করতেই হবে। তবে আজ নয়। এখন একটু বিশ্রাম নিতে চাই। আমি আমার মার কোলে শুতে চাই। হয়তো বিধাতার কাছে আমার কিছুই আর চাওয়ার নেই। তবু মনে হয়, দেখতে চাই অনুভব করতে চাই তোমাকে। যার চিত্র এত সৌন্দর্যময়, তবে সেই চিত্র শিল্পী কেমন হবে।

আমার মন যেন চিৎকার করে বলে ওঠে — ভুলতে পারব না। এরূপবতী প্রকৃতিকে আমি ভুলতে পারব না। আজ আমি ধন্য, আজ আমি ধন্য।

কোনো বড় কাজই কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার ছাড়া হয়নি।''

— স্বামী বিবেকানন্দ

সারাদিন চলার পথে যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হও,
তাহ .....

— মহাত্মা গান্ধী

Mobile Phone — Advantage & Disadvantage

Neha Das
Class - VIII

Mobile phone is one of the most advanced, convenient and time saving technolgies. That is being used by almost everyone around the globe. Nowadays it is available in various sizes and bears different technological features. For its diverse smat activities it is termed as smart phone.

Like every technological device it has both advantages and disadvantages. A mobile phone makes our life easier. It can be used for work, entertainment, or just to talk with family and friends. In today's generation, works like shopping, attending classes, mettings, booking tickets, booking hotels etc. are mostly done online by phone. The comunication system is becoming much more advanced, day by day. Not only that but also the speed of the internet is increasing higher and higher. Mobile phones have given us a lot of things upto our satisfactions within one touch. Because of a huge network, mobile phones have became a massive source of information and learning.

Inspite of having a lot of facilities, its disadvantages are grabbing us by every single second. Mobile phone use, and addiction have increased mental health diseases like anxiety, depression etc. People can't focuus on their work like studies due to the distoraction of mobile phone. Virtual converstations done by mobile phones are increasing the distance from friends and relatives.

While spending time on mobile phone or while scrolling social media people never got to know about the time. And our mind capture negative points faster than the positive one, therefore we get addicted to mobile phone. It is only our duty to keep ourselve free of distractions and to use the advantages of our mobile phones in our daily life, and keep increasing leaning skill and managing our time properly. Then only we can build a beautiful lifestyle inspite of having a mobile phone.

ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যে কথা মনে রাখতে হবে

গোপাল চন্দ্র তালুকদার
সহ শিক্ষক

ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। এ দেশে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র গুহক নামক এক চণ্ডালকে হত্যা করেছিল। আনন্দে দেবতারা স্বর্গে পুষ্প বৃষ্টি করেছিল। মহাভারতে দেখি দ্রোণাচার্য ছল করে ব্যাধ পুত্রের (একলভ্য) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে নিলেন। কোথাও এর প্রতিবাদ হয়েছিল বলে শোনা যায় না। সত্যবতীর কানীন পুত্র সকলের কাছে সমাদৃত। কুন্তীর কানীন পুত্র অবজ্ঞার, অপমানের, পরিচয় হীনের দলে। ভগবানের নামে ভক্তিরসে হাবুডুবু খেতে খেতে এ সব কথা ভাবার সময় পায়নি। ফলে সমাজের বুকে অন্ধ ধ্যানধারনা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, কৌলিন্য প্রথা, নরহত্যা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপনের মতো প্রাণঘাতি কুসংস্কার বাসা বাধল ভারতীয় সমাজে। জহর ব্রত নাম দিয়ে রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া হল আত্মহত্যাকে। শাস্ত্রের মোরক দেওয়া হলো সতীদাহ নামক নারীহত্যাকে। উপরোক্ত প্রাণঘাতি কুসংস্কারকে বাচিয়ে রাখার জন্য হিন্দু পণ্ডিত ও শাস্ত্রকারগণ হাতিয়ার করেছে ধর্মকে, শাস্ত্রের বিধানকে।

নানা সময়ে এ সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল এক ঝাক সমাজ সংস্কারক যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান মনস্ক, মুক্ত চিন্তার মানুষ। তাদের কর্মপ্রচেষ্টায় তৈরী হয় ব্যাপক আলোড়ন। যার পোশাকি নাম 'নবজাগরণ'। এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে কয়েকটি আইন পাশের কথা উল্লেখ করে নেওয়া যাক। যার দ্বারা সমাজ সংস্কারক মনীষীদের অবদান বোঝা যাবে। ১৭৯৫ সালে পাশ হয় গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন নিষিদ্ধ করণ আইন, ১৮০২ সালে পাশ হয় শিশুকন্যা হত্যা নিষিদ্ধ করণ আইন, ১৮১২, ১৮১৫ এবং ১৮১৭ সালে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বিধিনিষেধ। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতায় যে বিধিনিষেধ কার্যকরি করা সম্ভব হয়নি। শেষে ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন পাশের পর এ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। ১৮৪৩ সালে আইন করে 'দাস' প্রথা নিষিদ্ধ হয়। ১৮৪৭ এবং ১৮৫৪ সালে আইন করে 'নরবলী' প্রথা নিষিদ্ধ করা হয় এবং ১৮৫৬ সালে পাশ হয় বিধবা বিবাহ আইন।

উপরোক্ত আইনগুলি পাশ হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষে কি ভয়াবহ কুসংস্কার চালু ছিল তা আজকের দিনে অনুমান করাও কঠিন। এই প্রাণঘাতি প্রতিটি কুসংস্কার বা প্রথা সংঘটিত হত হিন্দু পণ্ডিত শাস্ত্রকারদের প্রত্যক্ষ মদতে।

কোম্পানি ও ইংরেজ শাসকগণ ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করে। তারা জানত আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ভারতীয়রা জানলে ভবিষ্যতে তাদের বিপদ। তা সত্ত্বেও উপরোক্ত আইনগুলি ইংরেজরা পাশ করতে বাধ্য হয়েছিল কেন?

কারণ এই কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে একটি যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্ক শক্তি কার্যকরি ছিল। এই যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক শক্তিধারা তিনটি ভাগে কাজ করেছে। (১) দেশের প্রচলিত ধর্মের মধ্যে যে মানবতাবাদী সূত্রছিল তা অনুসন্ধান করে বের করা এবং মানব কল্যাণ সাধন। (২) হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও'র অনুগামী ছাত্রদল যার পোশাকি নাম 'ইয়ংবেঙ্গল'। (৩) এই তৃতীয়ধারা ইয়ংবেঙ্গলের

ন্যায় তীব্র চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি বা অর্থের বৈভব নয়, বা রামমোহনের ন্যায় ধর্মসংস্কারও নয়, তিনি হলেন হীরক দ্যুতির ন্যায়, সৌম্য আলোক বিচ্ছুরণকারি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উপরোক্ত তিনটি ধারার বিষয়ে আলোকপাত না করলে কী প্রতিকূলতাকে তাঁরা অতিক্রম করে সমাজ প্রগতির ধারাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এনেছিলেন তা বোঝা যাবে না।

প্রথম ধারার প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। তাঁর জন্ম হুগলি জেলার রাধানগরে এক সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৭৭২ সালে। এ বছর তার সার্ধদ্বিশতবর্ষ চলছে। তাকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণতি। অসাধারণ মেধা মাত্র ৯ বছর বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন, সাথে সামান্য আরবি ফারসি পাঠও নেন। কৌতুহলি মন জানার আগ্রহে ব্যাকুল। গেলেন পাটনায় আরবি ফারসি অধ্যয়ন করতে। সেখানে করলেন কোরান পাঠ। মনে পরে গেল ছোট বেলায় 'মুতাজিল' (পির, সুফী সাধক)-দের সঙ্গ। যারা তর্ক বিতর্কে বিশ্বাসী, হিন্দু মুসলিম মানে না, তারা মানবতায় বিশ্বাসী উদার ধর্মের এক রূপ। পাটনা থেকে কাশী সেখানে পাঠ নিলেন বেদ, বেদান্ত পুরান এবং পড়ে ফেললেন উপনিষদ সমূহ। শুধু পড়ার জন্য পড়া নয়, বুদ্ধি অনুভব দিয়ে জানতে চাইলেন জীবনে অধ্যাত্ম ভাবনার স্থান কোথায়? ভেদবুদ্ধির কারণ কী? অসংখ্য দেব-দেবী কল্পনার মোহ কেন এল? কাশী থেকে ফিরে গেলেন তীব্বত। পাঠ নিলেন 'পালি' ভাষার। জানলেন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সার কথা। ডিগবি সাহেবের সাহচর্য এবং বন্ধুত্বে পাঠ নিলেন ইংরেজী, ফরাসী এবং হিব্রু। পড়ে ফেললেন বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট। জানলেন খ্রীষ্টধর্ম। হয়ে উঠলেন যথার্থ মানুষ।

জ্ঞান অর্জনের পাঠ শেষ করে শুরু করলেন যথার্থ মানুষের জন্য কাজ। ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার, পৌত্যলিকতা দূরকরার প্রচেষ্টা। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হওয়া ও কুসংস্কার দূর নয়, আইন করে চিরতরে বিলোপ করা। যার পরিণতি ১৮২৯ সালে নিষ্ঠুর 'সতীদাহ' নিষিদ্ধ করণ আইন প্রনয়ণ করা।

এছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষা, নারীশিক্ষা, বিষয় সম্পত্তিতে নারীদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা অনন্য। বিধর্মী সন্তানও যে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে অধিকার হারায় না সেটাও প্রমাণ করলেন মায়ের দায়ের করা মামলায় জয়লাভ করে। এইভাবে রামমোহন হয়ে উঠলেন ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ'। তৈরী করলেন 'ব্রাহ্ম সমাজ'। তৈরী হল একঝাক অনুরাগী মানুষ, ভিত্তি তৈরী হল আধুনিক ভারতের। যথার্থই নবজাগরণের 'অগ্রদূত'।

(২) দ্বিতীয় ধারাটি হল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী।

বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতা হিন্দু কলেজের যুব অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি মাত্র সতের বছর বয়সে ১৮২৭ সালে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছাত্রদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। যুক্তিবাদী ডিরোজিও বিনা বিচারে কিছুই মানতেন না এবং তার ছাত্রদেরও অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করে যুক্তিবাদী ও সত্যসন্ধানী হওয়ার পরামর্শ দিতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ছাত্ররা লক, বেন্থাম, হিউম, বার্কলে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দর্শনিক চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হন। তাঁর ছাত্ররা প্রচলিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিয় ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করেন। জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, প্রতিমা পূজা, সতীদাহ এবং প্রচলিত কুসংস্কার ছিল তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। খুব অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা কালাপাহাড়ের মতো বাংলার সমাজে আলোড়ন তৈরী করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ,

রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। এরা বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজসংস্কার প্রভৃতি কাজে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখে এবং চিন্তার জগতে বিপ্লব আনে।

(৩) তৃতীয় ধারার নেতৃত্ব দেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার না ছিল রামমোহন, দ্বারকানাথের মতো অর্থ, দেবেন্দ্রনাথের মতো আভিজাত্য এবং ইয়ংবেঙ্গলের মতো নব্যধনী বা উগ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার চাকচিক্য। তিনি হলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান, পিতা কাজের সন্ধানে কোলকাতায় আসেন, সাথে নিয়ে আসেন পুত্রকে। পিতার স্বপ্ন সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করে গ্রামে গিয়ে পুরোহিত গিরি অথবা টোলের পন্ডিত হবে। কিন্তু তিনি কোনটাই হলেন না, হোলেন 'বিদ্যাসাগর'। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে সিলেবাস থেকে 'বেদান্তকে ছেটে ফেললেন। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ সন্তান ছাড়া অন্যকেউ পড়তে পারবে না এই রীতি বাতিল করে সর্বসাধারণের জন্য কলেজের দরজা খুলে দিলেন। যুক্তি, মেধা, অক্ষয় মনুষত্ব নিয়ে সমাজের মানুষের মঙ্গল কামনায় ঝাপিয়ে পড়লেন। তিনি বুঝেছিলেন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, কৌলিন্য প্রথা এসবের মূল কারণ অশিক্ষা। তিনি নিজের উদ্যোগে ২০টি আদর্শ বিদ্যালয়, ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ইয়ংবেঙ্গলের মতো ধর্মকে অস্বীকার বা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ নয় বা রাজা রামমোহনের মতো নতুন ধর্মমত তৈরী নয়। যুক্তিবাদী মন নিয়ে বেদ উপনিষদের মধ্য থেকেই লোকাচার, ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেই বিধবা বিবাহ আইন পাশ করালেন। বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ রদ করার চেষ্টা করলেন এবং সফল হলেন। যুগে যুগে এই ধরনের সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাবের মাধ্যমেই সমাজ প্রগতির পক্ষে এগিয়ে চলে। আজও তার ধারা অব্যাহত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আজও কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে এবং চলবে। এ কাজ করতে গিয়ে রামমোহন রায় বিদ্যাসাগরকে জীবন সংশয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। আজও যারা এ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদেরও জীবন হাতে নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কারের বিরোধিতা ও বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার কাজ করতে গিয়ে বিগত ১০ বছরে পাঁচজন বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব আততায়ীর হাতে নৃশংস ভাবে খুন হয়েছেন। ২ জন মহারাষ্ট্রে, ২জন কর্ণাটকে এবং বাংলায় ১জন। ২০শে আগস্ট ২০১৩ ডা. নরেন্দ্র দাভোলকর, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ গোবিন্দ পানসারে, ৩০শে আগস্ট ২০১৫ অধ্যাপক এম. এম. কালবুর্গী এবং ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ গৌরী লঙ্কেশ। এছাড়া আমাদের বাংলার উত্তর ২৪ পরগণার দিলীপ মণ্ডল ১২ই আগস্ট ১৯৯৩ আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়।

(১) এদের অপরাধ এরা চেয়েছিল জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা, অনুশীলন এবং মানবতার সংকট নিয়ে চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটানো (২) মানব জীবনের ক্ষতিকর এমন কুসংস্কারের বিরোধিতা করা। (৩) জাদুটোনা, ব্ল্যাক ম্যাজিক, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতির অসারতা নিয়ে আলোচনা (৪) ধর্ম, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা (৫) ক্ষতিকর কুসংস্কার ও আচার বিচারের বিকল্পের সন্ধান দেওয়া, উপরোক্ত কাজে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলিকে সহযোগিতা করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যারা আত্মবলিদান দিলেন তাদের সম্পর্কে দু-চার কথা — ডা. নরেন্দ্র দাভোলকর ঃ পরিবারে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার ঐতিহ্য আছে। সে ইতিহাস না-ই বললাম। তিনি ছোটোবেলায় মেধাবী ছাত্র। ডাক্তারি নিয়ে পড়াশুনা করা। ডাক্তার হিসাবে ১৩ বছর চাকুরি। চাকুরি

ছেড়ে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে। তৈরী করলেন 'অন্ধশ্রদ্ধা নির্মুলন সমিতি'। এই সমিতি সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে দশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দিলেন। তৈরী করলেন ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটরি। তুলে ধরলেন অলৌকিক মাহাত্বের বিজ্ঞান। সহ্য হয়নি ধর্মের ব্যবসায়ীদের। ডা. দাভোলকর প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে ছিলেন। সকাল ৭ঃ২০ মিনিটে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের শাখা সংগঠন 'জনজাগৃতি সমিতি' নামক গুপ্ত ঘাতক শাখার সদস্য দুই মোটর সাইকেল আরোহী চার রাউন্ড গুলি খরচ করে চির নিদ্রায় পাঠিয়ে দিলেন।

গোবিন্দ পানসারে ঃ তারও পরিবারে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের ঐতিহ্য আছে। অল্প বয়স থেকেই হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার নিয়ে কাজ করেছেন। বস্তিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের কাজ, কুসংস্কার দূরিকরণের কাজ করেছেন। তার গবেষণা মূলক গ্রন্থ — **'Shivaji Kon Hota'** সাধারণ মানুষের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর গবেষণায় দেখালেন শিবাজী জাত ধর্মের বিচার করতেন না। মুসলমান ধর্মের বহুমানুষ তাঁর প্রশাসনে জাগয়া পেয়েছে। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ। যারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে, আসল সত্য প্রকাশিত হলে তাদের অসুবিধা। তাই অপেক্ষা করেননি। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। তখন দুইজন মোটর সাইকেল আরোহী খুব কাছ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়। ডা. নরেন্দ্র দাভোলকারের মতো একই কায়দায়।

অধ্যাপক এম. এম. কালবুর্গি ঃ কর্ণাটকের হাম্পির কন্নর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ। যুক্তিবাদী, কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে পুরোধা ব্যক্তিত্ব। কর্ণাটকে তার নিজের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচরণ নিয়ে ৩০ বছর গবেষণা করেছেন। তার গবেষণায় ধর্মান্ধ, স্বার্থান্বেষীরা আতঙ্কিত হন। তাকেও দুটি বুলেট উপহার প্রদান করেন।

গৌরী লঙ্কেশ ঃ কর্ণাটকের সমাজে পিছিয়ে পরা মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। কুসংস্কার ধর্মীয় মৌলবাদ কিভাবে সমাজকে, মানুষকে পিছিয়ে দেয় সেটা দেখানোর জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। সেই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি অবহেলিত, ধর্মান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে জাগিয়ে তোলেন। আঞ্চলিক ভাষায় তার পত্রিকা অসহায় মানুষের যেন আলোক বর্ত্তিকা হয়ে ওঠে তেমনি ধর্মীয় মৌলবাদীদের চোখের বিষে রূপান্তরিত হয়। তাকেও 'হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির ঘাতক বাহিনী রেহাই দেয়নি। ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৭, অফিস থেকে ফিরে বাড়ীর দরজার সামনে প্রবেশ করতেই আততায়ীরা গুলি করে হত্যা করে।

আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীরা কুসংস্কার বিরোধী কর্মসূচী ধারাবাহিক ভাবে করে চলেছে। ১৯৯৩ সালের ১২ই আগস্ট দক্ষিণ দাড়ি উর্দু স্কুলে কুসংস্কার বিরোধী কর্মসূচী পালন করার সময় রক্ষণশীল ধর্মীয় মৌলবাদী এবং ড্রাগ মাফিয়াদের আক্রমণে প্রাণ হারান।

দিলীপ মণ্ডল ঃ ড্রাগ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ!

উপরোক্ত ঘটনাধারা প্রমান করে মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই শুধু অতীতে নয় বর্তমানেও কঠিন। প্রতিকূলতা অতিক্রম করে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ লড়াই করে চলেছে। এরাই প্রগতির চাকাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আগামীতেও চলবে। বিবেকানন্দের বাণী দিয়ে শেষ করি '**কোন কিছুর জন্যই আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া যায় না, কিন্তু আদর্শের জন্য সব কিছুকেই বিসর্জন দেওয়া যায়।**'

চাকদহ রামলাল একাডেমী প্রেক্ষাপট ও কিছু কথা

বিজন কুমার চক্রবর্ত্তী
শিক্ষক (ইতিহাস বিভাগ)

চক্রদহ, নদীয়া জেলায় অবস্থিত একটি গঞ্জ। মূলতঃ কৃষিভিত্তিক গ্রাম দিয়ে ঘেরা। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে জোসেফ মেলেক্ বেগ্লার নামে একজন আর্মেনিয়ান সাহেব চাকদহকে একটি পৌর শহরে রূপান্তরিত করেন। অতীতে পলাশির যুদ্ধের পূর্বে জর্জ ব্যারেটো নামে এক ইংরেজ সাহেব চাকদহকে কেন্দ্র করে নীলের চাষ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। চাকদহের আনন্দগঞ্জ বা পুরাতন বাজারে যখন গঙ্গার তীরবর্তী বন্দর ছিল সেখানে বহু পাটের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। সেই পাট চাকদহ পাট নামে সারা দেশে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

এহেন চাকদহের বেশ কিছু সাংস্কৃতিক এবং প্রত্নতাত্বিক ঐতিহ্য আছে। তার আগে বর্তমান চাকদহের ভৌগলিক অবস্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার। বর্তমান চাকদহ শহরের পূর্ব দিক দিয়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক উত্তর দক্ষিণে চলে গিয়েছে। চাকদহ শহরের মাঝখান দিয়ে রেলপথও উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত। পূন্যতোয়া ভাগীরথী চাকদহের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত। চাকদহ শহরের দক্ষিণে পালপাড়ায় রাজা রাঘবরায় কর্তৃক নির্মিত প্রায় পাঁচশো বছরের প্রাচীন বাংলার চারচালা মন্দির টেরাকোটার নক্শা সহ চাকদহের একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এছাড়া যশরায় অবস্থিত মহাপ্রভুর দ্বাদশ সখার অন্যতম জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাঠ এবং তাঁর স্থাপিত জগন্নাথ মন্দির ও দোলমঞ্চ। কাঁঠালপুলিতে রয়েছে মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাঠ। সুলতানিযুগে এবং মোঘল যুগে চাকদহের পালপাড়ায় বেশ কিছু অভিজাত মুসলমানদের বসতি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বড় কাজী বাড়ি এবং সংলগ্ন মসজিদটি উল্লেখযোগ্য। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই পরিবারের সন্তান মীর্জা ইতেসাম্উদ্দিন মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের দূত হিসাবে সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। চাকদহের থানার মোড় থেকে দক্ষিণে সুখসাগর রোড ধরে গঙ্গাতীরে ওয়ারেন হেস্টিংসের কান্ট্রি হাউস ছিল। যা বর্ত্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত। চাকদহ শহর থেকে তিন কিমি পূর্বে ভট্টাচার্য্য কামালপুরে নব্যন্যায় চর্চার যুগের বাচস্পতি, পণ্ডিত বনমালী বিদ্যাসাগর, বলরাম তর্কভূষণ প্রমুখ দিগ্বিজয়ী নৈয়য়িকদের আবির্ভাব ঘটে। এছাড়া সুখসাগর, পালপাড়া যশড়া, কাঁঠালপুলি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বাস ছিল যাঁরা এখানে ছোট-বড় টোল স্থাপন করে তৎকালীন সময়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটান।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে চাকদহের পালপাড়ায় ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী কাশীশ্বর মিত্রের উদ্যোগে একটি কেরানী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্থিক সাহায্য করতেন এবং ছাত্রদের স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করতেন।

যাঁরা চাকদহের ইতিহাস চর্চা করেছেন তাঁরা অনেকেই মনে করেন এই বিদ্যালয়টি চাকদহ রামলাল

একাডেমীর পূর্বসুরী। চাকদহ থানার মোড়ে সুভাষনগরে অবস্থিত নীলকুঠির একটি চৌরিঘর ছিল। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানে চাকদহ ভবানীপুর নিবাসী বেণীমাধব বোস নামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক চাকদহের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের এবং কৃষক সন্তানদের ইংরাজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে চাকদহ রেল স্টেশনের পশ্চিম পাড়ে প্রায় একবিঘা জমি প্রায় দান হিসাবে পাওয়া যায় সেখানে মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়টি উঠে আসে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বেণীমাধব বোসের মৃত্যু হলে উত্তর ঘোষ পাড়ার রায় বাহাদুর কালীচরণ দত্ত মহোদয় সম্পাদক হিসাবে মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়টির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রায় বাহাদুর কালীচরণ দত্ত কয়েক বৎসর পর থেকেই স্থানীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত কিছু ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে উন্নীত করার চেষ্টা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাবু বসন্ত কুমার মিত্র, দুর্গাগতি ভট্টাচার্য্য যজ্ঞপতি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের প্রচেষ্টায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখে মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বিদ্যালয়ের আর্থিক উন্নতির জন্য একটি দান সংগ্রহের কমিটি করা হয়। ছাত্র সংগ্রহের জন্যও কমিটি গঠন করা হয়। শিশু শ্রেণী থেকে ১১টি শ্রেণীর প্রবর্তন করা হয়। বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় 'বেণীমাধব ইনস্টিটিউশন'।

অতঃপর বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পাকাবাড়ি নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যশড়া নিবাসী বসন্ত মিত্র মহোদয়ের পরামর্শে পূর্বে চাকদহের ভবানীপুর নিবাসী তখন কলিকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট নিবাসী নিঃসন্তান ব্যবসায়ী রামলাল সিংহের কাছ থেকে দান পাওয়ার আশায় কলিকাতার তাঁর বাসভবনে বসন্ত মিত্রের নেতৃত্বে উপরোক্ত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হন। রামলাল সিংহ বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা দান করতে প্রতিশ্রুত হন। তাঁর দানে ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ি নির্মিত হয় এবং রামলাল সিংহের অবদানকে মনে রাখার জন্য বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় চাকদহ রামলাল একাডেমী।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট বাবু খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিন মাসের মধ্যে তিনি আইন ব্যবসার জন্য হাওড়ার সালকিয়ার চলে যান। প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ। তিনিও স্বাস্থ্যের কারনে পদত্যাগ করলে সুরেন্দ্রনাথ ঢোল প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁর সময়ে উচ্চ বিদ্যালয়টিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির জন্য আবেদন করা হয়। বিদ্যালয় পরিদর্শকের রিপোর্ট অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জীথিবট সাহেব বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের অনুমোদন এর চিঠি দেন। বিদ্যালয়টি অবশেষে ১৯১০ সালে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্বীকৃত উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এই পর্যন্ত সংক্ষেপে রামলাল একাডেমীর উচ্চ বিদ্যালয় রূপে গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট।

এরপর যা আলোচনা করব তা বিদ্যালয়ের বিকাশের ইতিহাস। যেহেতু তৎকালীন সময়ে উত্তরে রানাঘাট, দক্ষিণে হালিশহর পূর্বে বনগ্রাম এবং পশ্চিমে বলাগড় ছাড়া কোথায় ইংরাজি শিক্ষার উচ্চবিদ্যালয় না থাকায় বিদ্যালয়টির বিকাশ লাভ করতে থাকে। চাকদহ রামলাল একাডেমির শিক্ষা সরণিতে বটুকনাথ ভট্টাচার্যের কথা না বললেই নয়। ১৯১৯-১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের স্বার্থে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য স্বয়ং তাদের কোলকাতার

পরীক্ষা হ'লে পৌছে দিতেন। এমন ছাত্র দরদি ও শিক্ষাপ্রেমী ব্যক্তিত্ব আজ বড়োই দুর্লভ।

প্রধান শিক্ষক আশুতোষ দত্ত, রায়বাহাদুর কালীচরণ দত্তর ভ্রাতুষ্পুত্র, দুটি আলাদা সময়কালে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাঁর দানে এবং পরিচালন সমিতির প্রচেষ্টায় রায় বাহাদুর হল নামে একটি বৃহৎ কক্ষ নির্মিত হয় চল্লিশের দশকে। এরপর বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ব্যানার্জী প্রধান শিক্ষক হন, তিনি এক নাগাড়ে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সময়ে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তালতলা ভবন নির্মিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজস্ব খেলার মাঠ পায়। তৎকালীন পরিচালন সমিতির সম্পাদক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় এব্যাপারে প্রধান কৃতিত্বের দাবীদার। বীরেন বাবুর সময়ে বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, চালু হয় বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং কলা বিভাগ। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের H.S. পরীক্ষার ফলাফল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। ১৯৬৮ ব্যাচের ছাত্র সমর গুহ রায় রাজ্যের মধ্যে ষষ্ঠস্থান অধিকার করে। সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী বীরেনবাবু বিদ্যালয় পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য মুন্সিয়নার পরিচয় দেন।

পরবর্ত্তী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্র নাথ সরকার। এই সময় প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন জগবন্ধু সাহা, রাশভারী মানুষটি দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনার চেষ্টা করেন। পরবর্ত্তী প্রধান শিক্ষক সুবলচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং সুদক্ষ শিক্ষক তিনি জাতীয় শিক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মার হাত থেকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন এবং পুরাতন ভবন নতুন করে বিন্যাস করেন।

এরপর আমরা পাই বিপুলরঞ্জন সরকার মহাশয়কে ১৯৯২ খ্রিঃ থেকে ২০০২ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সময়ে পুরতন ভবনের সংস্কার শুরু হয়। বেণীমাধব হল ভেঙ্গে পূর্ব দিকে নতুন বাড়ি নির্মান শুরু হয়। তালতলা ভবনের দক্ষিণে দোতলায় ওঠার নতুন সিঁড়ি তৈরী হয়। তাঁর সুদৃঢ় পরিচালনায় বিদ্যালয়ের শ্রেণী শিক্ষা এবং অফিস পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য দক্ষতা প্রকাশ হয়।

বিপুলবাবুর অবসর গ্রহণের পর রসায়নের শিক্ষক ধনদা প্রসাদ মৈত্র ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হন। তিনিই প্রথম তালতলা ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মানের উদ্যোগ নেন। ২০০৫ সালে ধনদাপ্রসাদ মৈত্র অবসর গ্রহণের পর সোমনাথ মজুমদার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হন। তার সময়ে তালতলা মাঠের সংস্কার হয়, পুরাতন ভবনের তিনতলা ল্যাবরেটরী নতুন ভবনের Toilet Complex নির্মিত হয়। ২০১২ সালে প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন আনন্দময় মণ্ডল মহাশয়। তিনি সম্পর্কে পূর্বতন প্রধান শিক্ষক সুবলচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের ভ্রাতুষপুত্র। তাঁর সময়ে অনেক উল্লেখযোগ্য সংস্কার উভয় ভবনেই হয়েছিল। তালতলা ভবনে ছাত্রদের সাঁতার শিক্ষার জন্য সুন্দর সুইমিংপুল, মিনি ইনডোর, জিমন্যাসিয়াম, সৌরকোষ, খেলার মাঠের সংস্কার, মাঠের পূর্বাপ্রান্তে গ্রিল দিয়ে ঘেরা সাইকেল গ্যারেজ, পুরাতন ভবনে চারতলা বিল্ডিং নির্মাণ, মুক্ত মঞ্চ, শিল্প কারুকার্য মণ্ডিত, সামনের প্রাঙ্গন, চারতলা সমান উচ্চতায় শেড দিয়ে ঢাকা। প্রাক্তনীদের একটি অফিস ঘর, মুক্তমঞ্চের ডান দিকে বৃহৎ খোলা বারান্দা পুরতান ভবনকে এক নতুন রূপে এবং নতুন আঙ্গিকে সজ্জিত করা উভয় ভবনেই বাগান তৈরীর প্রচেষ্টা করেন। মহাপুরুষদের মূর্তি, বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকদের মূর্তি বিদ্যালয় ভবনকে এক নতুন ধরনের বিন্যাস দেয়। শ্রী

আনন্দময় মণ্ডলের প্রচেষ্টায় এবং সমকালীন সহ-শিক্ষকদের সহযোগিতায় মাধ্যমিক এবং উচ মাধ্যমিকে অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয়। অনেকগুলি ছাত্র এক থেকে দশের মধ্যে (রাজ্যের মধ্যে) স্থান লাভ করে।

পঞ্চম থেকে দশম ইংরাজি মাধ্যম বিভাগ (Co-educaiton) তাঁর অন্যতম পরিকল্পনা। তাঁর অবসর গ্রহণের পরে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বিভাগ চালু হয়। বর্তমান প্রধান শিক্ষক ড. রিপন পাল বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে সোমনাথ মজুমদার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে পূর্বসুরীদের কর্মকাণ্ডকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করেন। বিদ্যালয় ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করে।

ড. রিপন পাল বর্তমান প্রধান শিক্ষক ২০২০ সালের অক্টোবরে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। করোনা কাল কাটিয়ে তাঁর কর্মদক্ষতা ও কর্ম কুশলতার কারণে বিদ্যালয় একবিংশ শতক থেকে সফল ভাবে দ্বাবিংশ শতকের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ড. পাল বিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিকাঠামো, জ্ঞানের উন্নতি, বিদ্যালয়ের অফিসের দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রভৃতি বিষয়ে নজর দেওয়ার ফলে বিদ্যালয়ের অসাধারণ উন্নতি পথে চলেছে। ইংরাজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম, ভোকেশনাল সমস্ত বিভাগগুলির উন্নতি ঘটছে। ভূতপূর্ব সভাপতির ৭ লক্ষ টাকা দানে একটি স্মাট ক্লাস নির্মিত হয়। এব্যাপারে সভাপতি মহাশয় (প্রাক্তন) শ্রী অঞ্জয় কুমার শাসমল এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা শাসমলের অবদান অনস্বীকার্য।

চাকদহ রামলাল একাডেমী এতদ্‌অঞ্চলের pioneer হিসাবে পরিগণিত। এই বিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে শুধু নিজেকে বিকশিত করেনি চাকদহের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ম এবং বিকাশে রামলাল একাডেমী তাঁর পরিকাঠামো এবং তৎকালীন শিক্ষক মহাশয়, পরিচালন সমিতির সম্পাদক প্রমুখের পরিশ্রমে এবং বদান্যতার সফলভাবে গড়ে উঠেছে। অন্যতম উদাহরণ হিসাবে বসন্তকুমারী বালিকা বিদ্যাপীঠ এবং চাকদহ কলেজের কথা বলতেই হয়।

বিভিন্ন দেশে, যেমন বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, বণিজ্য, খেলাধুলা সমস্ত ক্ষেত্রে যে অসাধারণ রত্নরাজি এই বিদ্যালয় প্রসব করেছে, তাঁরা — দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, দেশ সমাজকে অগ্রগতির পথ দেখাচ্ছে। আগামী দিনে আরো অনেক রত্নরাজি প্রসব করে এই বিদ্যালয় দেশ জাতির উন্নতির অসাধারণ অবদান রাখবে এই আশা রেখে লেখা শেষ করছি।

"যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন,
সে দেশের হিতসাধনে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম।"

— বিদ্যাসাগর

প্রবাদ প্রবচনে - বাঙালীজীবন

রাখী ভৌমিক

শিক্ষিকা (ভোকেশনাল বিভাগ)

প্যাণ্ডেলের থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিল বিনয় আর অনিমেষ। বিকেলের অনুষ্ঠান নিয়েই কথা বলছে। হঠাৎ বিনয় বলে ওঠে 'গেয়ো যোগী ভিখ পায়না' সাথে সাথে অনিমেষ বলে ঠিকই বলেছ, পাড়ায় কনিকা ও রঞ্জনের মত শিল্পী থাকতে ওরা কলকাতা থেকে শিল্পী আনছে। শুনলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগছে! এত টাকা দেবে কী করে?

বিনয় হাসতে হাসতে বলে 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।'

অ্যাঁ! এই গৌরী সেনটা আবার কে?

কেন, প্রেসিডেন্ট সুকমল সরকার। বড় ব্যবসায়ী। প্রচুর টাকা।

বিনয় আর অনিমেষের কথার মাঝে ছোট্ট টুপু সেখানে এসে জানায় তাদেরকে নকুল খুড়ো ডাকছেন।

আলোক সজ্জা, অনুষ্ঠান সূচি তৈরি, অতিথিদের আপ্যায়ন — সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিয়ে নকুল খুড়োর এখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। বিনয় আর অনিমেষ এসে তাঁকে সাহায্য করায় সেই সময়ের কাজগুলো গুছিয়ে তিনি হাফ ছেড়ে বলেন 'দশের লাঠি একের বোঝা'।

ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় ছোট্ট মিনুর সুরেলা কণ্ঠে 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' গানটি দিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব অনিমেষের। সুকমল বাবুর স্বাগত ভাষণ, অতিথিদের আপ্যায়নের পর শুরু হল শিল্পীদের গান। বেশ সুন্দরভাবেই অনুষ্ঠান চলছিল, হঠাৎ করে দর্শকদের মধ্যে কী নিয়ে একটা গণ্ডগোল বেধেছে। নকুল খুড়ো ক্লাবের কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখেন বিনি ঠাকুমা রমেনকে গালমন্দ করছেন।

আসলে বিনি ঠাকুমা বাদাম ভাজা কিনতে গিয়ে দেখেন তাঁর পয়সার ব্যাগটা নেই। সেইসময় তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রমেন। ঠাকুমার ধারণা রমেনই তাঁর ব্যাগটা নিয়েছে। তিনি বার বারই বলছেন 'ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে'।

একথা বলার কারনও আছে। কিছুদিন আগেই রমেন মুরগি চুরির অপরাধে ধরা পড়েছিল।

চিৎকার চেঁচামেচির মাঝে মিনু দৌড়ে এসে ঠাকুমার হাতে পয়সার ব্যাগটি দিয়ে বলে তোমার ব্যাগটা বসার জায়গাতেই পড়েছিল। তুমি খামখা-ই রমেন দাদাকে বকছিলে। ঠাকুমা বাদাম ভাজা কিনে মিনুকে নিয়ে আবার জায়গায় গিয়ে বসেন।

রাত ন'টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলার কথা, আটটা নাগাদ একটা ফোন আসায় প্রেসিডেন্ট চলে গেলেন। ক্লাবের যে উচ্চিংড়ে ছেলেগুলো এতক্ষণ শান্ত ছিল, তাদের অবস্থা হল 'আসমানের চাঁদ হাতে পাওয়া'র মতো। শুরু হল বিশৃঙ্খলা। বিশু, কার্তিক, হারু এরাতো 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। এদের ঠেকানো নকুল খুড়োর কম্ম নয় বুঝতে পেরে বিনয় প্রেসিডেন্টকে বিষয়টা জানায়।

এরপরই সেখানে এসে হাজির হয় তন্ময় বসাক। 'চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না' বলেই তিনি আসার সাথে সাথে ছেলেগুলো পালায়। যাটোর্দ্ধো তন্ময়বাবু পুলিশের চাকরি থেকে অবসর নিলেও, আজও তাঁর ক্ষমতা অনেক।

পরিস্থিতি সামলে গেলে নকুল খুড়ো বলে ওঠেন 'মরা হাতি লাখ টাকা'। কথাটা শুনে তন্ময়বাবু মৃদু হেসে দর্শকাসনে বসে পড়েন।

Mars Gas

Debkumar Mandal
Teacher

It was hot summer day. All the day it was patchy and scorching Samiran, like every day, went to university. He was a student of chemistry. That day he was late to return home. He went to his friend's home at Kalyani. Very often he visited friend Subodh's place at Kalyani. There they discussed different topics. After sunset he got out from Subodh's home. All of a sudden the northern sky became dark. Darkness rapidly spread all over the sky. Wind began to blow. It gradually strengthens its power and formed a severe northwester. It accompanied heavy shower and thunder. Samiran struggled a lot in that adverse weather condition and somehow managed to reach Kalyani Railway Station. The station area was over crowded as train service remained stopped for hours. It was 7:30 pmn already. Samiran was restless. Unknown anxiety overwhelmed him.

Samiran lived in a village at Chakdaha named Uttar Ghugia. It was three and a half kilometers away from Chakdaha town. It is on the bank of a small river, the Budi Ganga. Almost throughtout the year it was full of water except the hot summer. Then there would be four to five feet depth. The village was calm and surrounded by paddy fields. The fertile lands of the village used to keep the villagers happy and prosperous. In autumn golden crops gglitters the village still now. Green wraps it is spring. Though it was a big village population was respectively low. The river is in the west. To the south a canal from the Budi Ganga joins the river with another river the Ichhamati, and then it was known as the Marali. Actually it was a tributary of the Budi Ganga in the ancient time, during the British rule. It was a river with high trading capacity. It was said that in the 19th century indigo traders set up their port and farm here. They tortured on the villagers and occupied their lands to cultivate indigo. There was a small almost broken bamboo bridge on the canal. The village had no electricity. There was a temple of Goddess Kali on the south bank of the canal.

The northwester stopped at about 8:30 pm. The train service resumed. Samiran reached Chakdaha by 9:15 pm. It was load-shedding. He took his cycle from the garage and started for home. Here and there water logged in the potholes. He went alone. The sky was becoming clear. The moon came out. The stars began twinkling one by one. The moon seemed surprisingly brighter. At a time he kept behind the town and villages. Now he reached the place where there were no houses. The road bisects a deep jungle. The trees were bowing down their heads to welcome the passersby. Beyond the rows of the trees the river flows gently producing nature's own music. He was

charmed by the atmosphere. Bright moon light peeped through the leaves; insects called sharp. Dogs barked often; foxes growled at a distance. Everything created a supernatural feeling. He became very excited. He slowed down the speed and began to sing ' aaj jotsna rate sobai gechhe bone…' nothing around him could disturb him. He was going on. Suddenly he stopped cycle. What's that? ---- He whispered himself. A fire ball at the turn ahead. Gradually it took the shaped of a big ball and moving towards him. He was afraid. Perspiration drenched him. He began to shiver. What was to be done? When the fire ball was about to hit him he wittingly bend his head down. The ball hit a dead dry tree and set it ablaze. He thought for a moment looking at the turn ahead and seeing nothing he advanced. Still he was in afraid. Nearing the turn he looked around but saw nothing. He looked down to the ditch by the road. Now he could understand the origin of the fire ball as he was a student of chemistry. It was nothing but 'mars gas', formed in the mud and came out. Getting contact with the air it caught fire. He laughed himself. And now he advanced close to the bamboo bridge. The water level got higher for the rain that day. It was hard to ride the cycle. He got down and took the cycle on his shoulder. Actually he had wade through the logging water as the road was low here. When he was at midway he heard a faint whispering but could not see anybody. He could hear two voices – a male and a female. He was curious and looked around. Far away there was a boat in the canal. Two shadowy figures were there. He thought that lovers were boating and enjoying the moonlit night after heavy shower. He moved on and came to the bridge. There he saw a man sitting on the railing of the bridge with face covered. 'Kushal' , he enquired. 'no, Haran', answered the shadow.

'oh!

Suddenly something heavy fell in the water. He turned bank…..

Nobody was there on the railing. He ran to the railing. Looked downward. Nothing was there. How strange! Water in the canal was still.

At that very moment he heard two firing sound. Two lovers on the boat cried out death cry. It seemed very near. He tried to find the boat. But where was the boat? He was sweating again. Cold current began to blow through his bones. He began to tremble. He called his friends loudly but in vain. How could they hear him? Who was there? He fainted.

Next morning when he woke up his elder sister and mother sat down near his head and he was running high temperature. He asked them what happened. His mother said to him, seeing his late she sent his father to escort him and he had found him on the bridge senseless.

Mother asked what happened to him. Samiran told her everything. His mother told him the real story of the lovers and Haran. Samiran experienced a nightmarish love story of the 19th century.

A Russian Tête-à-Tête

Tanika Ray
Class - XI

Two months ago, I, Anastasia Sokolova, a freelance journalist, was in Moscow to report a story about the ongoing Ukraine war. There, at a café, I heard a completely different story which is far more hair-raising than the war itself. I heard this story literally by chance and am absolutely uninvolved in judging the truth of it. I hope that the reader would come to their own conclusion after I finish telling them about it and that it would at least be able to entertain their mind. For the sake of information, I will be changing the names of all real-life characters and places (except Moscow) involved in the story for some unavoidable reasons.

I was strolling through the streets of Moscow on a frosty March Russian evening to find a suitable place to start covering. At last, I made my mind to begin by talking to the people inside the Café Pushkin that stood in front of me.

Entering the café, the first person that caught my attention was an old man close to sixty, with a coffee and a heap of papers that almost covered his drink. The man seemed to pay no attention to his drink and was completely into his work. I thought that talking to him would be useful as he might contribute some of his recollections of the Soviet era to my story which would add more spice to it. So, I opted to start with him. I was perfectly aware that asking for his opinion directly about the war would be of no use as even a child knows how the Russian commoners are always too timid to express their opinion about controversial topics publicly. Therefore, I decided to begin by asking what he was doing with such a focus (presumably that was some academic work) and then throughout the natural flow of conversation, I anticipated that I would succeed in bringing out his opinion. My identity, of course, would be concealed.

I ordered a cappuccino for myself and advanced towards the old man's table. I gently cleared my throat and very formally took my seat on one of the three chairs at the table. He seemed to have given a start at the sound of my throat and at the soft grating by the chair when it was pulled against the café floor. Giving me a glance as if he was a bit irritated to have a stranger at his table, he sank into his work again.

For almost three minutes I observed the man very carefully. He had an almost square face and was wearing an expensive pair of Italian shoes. But the peculiar thing was that along with the premium pair of shoes he was wearing a dirty pair of beige trousers and a turquoise shirt so old and faded that it looked as if it would get torn up at any moment. His shoulder-length hair was completely white. His face full of gray beard suggested that he had not shaved for at least a month. Looking at him, one would get the feeling that he used to have very handsome features in his youth but now he had grown fatter with age. I also noticed that he was studying a quaint script very carefully.

I broke the silence by clearing my throat again and then I asked the man, 'May I have the privilege to know what you are looking at, sir? I am overpoweringly curious about the sheet in your hand…I mean, I must admit that I haven't seen that peculiar thing anywhere before.' He replied, 'I could have told you, but you are such a young and fresh and vivid lady, you shouldn't stuff your head with this junk. Besides, it holds some truth that are rather unpreferred.'

'If that is your concern, then I should tell you that I am a bachelors student of cryptology at the Moscow State University and my name is Marya Nikolievna Sokolova (and how gracefully did I disguise myself with my sister's identity! Also thankfully, I taught myself the rudiments of cryptography when I was a teen). So, I believe you understand the basis of my nosiness...'

He stared at me for some moments. Then as if realizing the fact that I am not any government agent or anything of that kind, he replied in short, 'It is the most ancient English script ever found.'

'May I have a look?' asked I, cynically.

He, as if discerning my disbelief, said, 'I knew that you wouldn't believe it, but that doesn't stop you from having a look at it.'

He handed me the sheet of paper with the queer thing written on it. Unfortunately, because of the cryptologists reading this story out there, I cannot reproduce the things written on that sheet here.

I, paying a glance at it, remarked, 'Pardon me, but there is no way I can relate this text with English! Where did you find it?'

He said, 'Well, my name is Pyotor Alexeivich Zakharov and I am a professor of history at a university at Nizhny-Novgorod.'

I immediately interrupted him, 'You

specialize in the English history I suppose?' 'Yes, but not in the way you think. Actually, I officially have always been a specialist in modern Russian history. Way back in 2015, a group of scuba divers discovered a chest under the Sea of Japan. The incident did not catch the attention of the majority. However, a small bit of writing along with a photo of the chest was published in the Moscow Times.

'The photograph somehow managed to attract me. So, I gave a call at the Moscow Times office and from there I found that the group of the scuba divers was based in South Korea. I immediately contacted them and told them that I would like to join them in their upcoming summer dive.'

'You wanted to dive? Forgive me, but at such an age!'

'Well, the age was not a barrier for me as I used to be too involved in sports activity as late as eight years ago. So, I didn't face much trouble for the medical statement.

'But I didn't know that even if diving could have been manageable, examining the chest as I aimed was not as easy as I thought. When we reached the chest, which thankfully was not moved anywhere by anyone, I along with another two close friends of mine who had also joined the team slowed ourselves a bit. When the rest of the team had gone considerably far away, the three of us pulled the lid of the chest with all our energy put together. But it was refused to budge! After putting a lot of effort for about a quarter of an hour, we somehow managed to open the apparently immovable lid. But opening it was just the start of a series of another serious challenges. Immediately after opening the lid, an unbearably hot stream of water rushed out of it due to some incomprehensible reasons and killed the other two immediately. I had just managed to dive away from the range of the heat to save myself.

'However, my dominant curiosity prevented me from returning. Therefore, I went back to the chest and directly put my hand into it. I was fully conscious that moving the enormous chest would not possible by me alone. So, I opined that I must take as many things from inside the chest as I can. I can't deny that the words "El Dorado" or "Atlantis" came a couple of times to mind after I had seen the chest, but never did I know that the climax was going to be far more thrilling than that.

'Anyway, touching inside the chest I had a freezing sensation. Besides the freezing stuff there was something which

I guessed to be a big bundle of sheets of paper. As I took it out, I saw that my guess was not wrong. It indeed was the scattered sheets of paper, about a thousand in number, one piece of which is currently being held by you in your hands. And the threateningly freezing stuff was a piece of bone that resembles very closely the human humerus.

'But then another round of hot stream started to come out and it grew absolutely unendurable. So, I decided not to stay any longer in that unfathomable abyss. So, I dived up and then returned to Moscow a day later.

'On the very day of my return, I called on my friend, the renowned cryptologist, Dr. Ivanov. He invited three more men — a linguist, a cryptographer and an archeologist to his place the next day. They together started working immediately. By their systematic approach, when they managed to decipher the script finally within a couple of weeks, it turned out that the language of the text is actually English!

'The text says that there was an ancient civilization in an island called Inga, which was somewhere close to the present day's Korea, on the Sea of Japan. The anonymous text, with its writer not mentioned, claims itself to have originated from Inga. Additionally, it claims that it is from 46 BC. Carbon dating of it also doesn't deny this claim. Notice, ergo the posited Inga civilization existed at the time of Caesar's reign!

'Inga was the most advanced in technology: maybe a hundred times more trailblazing than what we have managed to do until today. They invented war weapons so lethal that some of them had the potential to destroy the whole Europe completely within a matter of seconds. The process of developing some of them, which will raise your hair very easily, are even mentioned in the text. They had also developed a systematic way to predict the far future with a very little inaccuracy.'

'Has the way been mentioned in the text?' I asked excitedly.

'Yes. But I haven't understood a bit of the math.'

'Do you have any plan to hand it to any physicist or someone of that kind?'

'Not at the moment.'

This reply bothered me a little. But without noticing it Pyotor Alexeivich went on, 'Using their principles of predicting the future, they prognosticated in this text that their civilization on the Sea of Japan would be destroyed in 28 BC in a destructive tsunami due to a cataclysmic earthquake. And any observant person

could tell at the first sight that the chest in the Sea of Japan got buried that way due to an earthquake. Anyway, so, as the text claims, the authority of Inga would start to rehabilitate safely their inhabitants in an an island dominated by indigenous peoples close to the Celtic Sea, i.e., in the present British Isles with the help of their supersonic modern jet plane-like airships from as early as the time of publishing the text itself. Although they were very advanced in technology, their destiny allow mercy their intellect to build something for taking away all their heavy machinery in the far Celtic region within the short period of time. So, most of their technologies got buried deep in the abyss of water and the Ingas started to lead a simple life resembling that of the indigenous people. Such is the actual English history just before the Roman conquest. The manuscript is so threateningly beautiful that at least once in every year I return to it to examine for a new piece of detail that my eyes had avoided last time.'

By this time, I was almost shaking. I remarked, 'So, publishing your discovery would turn our knowledge of history absolutely upside down!'

'Yes, it would. But, discovering this bit of forgotten past, although by chance, wasn't that difficult except that nearly fatal expedition, you know! It's only because our historians are too busy in disputing about the civilizations which are very boringly merely western. Had they looked into the eastern world with a bit more care, they would have discovered many gems like this that values far more than the stale western history by now.' He answered indifferently.

'So, when are you going to publish your discovery? It alone can bring you world fame and your name would be known literally to everybody within a year of publishing the paper.'

'I know that publishing this in the form of a paper would bring me fame and fortune, but, no Marya Nikolievna, I won't never do it because concealing history sometimes does us good. If I had published my discovery and the text, then the 'current war would have been many a times worse, you know...'

Milky Way Galaxy

Uma Shankar Chatterjee
Class - IX

We, the humans live in our tiny home earth. The universe is super massive and it includes millions and millions of galauies. One of the galaxy is our Milky Way Galaxy. It is almost at the centre of the universe according to the calculation of experienced Astronomers. It diameter is about 105700 light years or 10^{18} Km (approx). It approximately contains 100 thousand million stars. It is 3.6×10^{13} Himex bigger than Earth. At the middle of Milky Way Galaxy (sagittarius A*) a supermassive black hole lies. Not only Milky Way Galaxy is only a spot of life but it may happen that in other galaxies there is life but we haven't recognized because only to leave our Milky way galaxy a rocket needs 2,00,000 years. So we have to wait upto the imporvement of our technology.

Andromeda Galaxy :

Other than milky way in our local group of galaxies the biggest member is Andromeda galaxy. It is the nearest galaxy to us. The nearest means 2.5 million light years away. It's weight is 1 trillion Solar massess (2×10^{42} Kg). It's diameter is 220,000 light years. It has more stars than milky way. It contains one trillion stars. This galaxy is also known as messier 31 or NGC 224 nd originally the Andromeda nebula.

The Solar system.

The Andromeda galaxy and milky way galaxy are estimated to collide in 4.5 billion years. Which is comming towards Milky way at a speed of 110 km/s. It will make a new galaxy 'Milkomeda' have 2.75% chance of Jumping into Audromeda have, 27.6% chance of being at an end of milky way and the rest per centage is of vapourising because after the collition of the two super massive massive blackholes at the middle of two galaxies, Milky way and Andromeda a guazer will be created. A guazer is a form of throwing out excess matter in a blackhole so we can easily vapourize there. But we don't have to wait so much because the sun is going to blast in 500 million years. So no need of tension.

PART - 2

UY Scuti :

Among the whole universe UY Scutis is the most massive, heaviest and farthest.

This star can be found in the constellation 'Scutum'. It has a radius of 1.188 billion Km. Only the surface temperature is 3091°C. It can sawallow any planets with few minutes. But we don't have to worry because it is 9459 light years away. It is a red supergiant star and it is evolving now into a red Hyper giant star. It has an intense luminocity it is 34,0000 luminous than our Sun. Sun is even smaller than a point in front of UY Scuti.

Phoneix - A

Phoneix A is also the biggest blackhole in our universe. It contains the mass of 100 billion suns. It is also called an Ultra Massive Black hole (UMBH). It nearly contains 10% mass of Milky way. It was found in the Phoneix Constellation by 2010. The whole Solar system is like a point infront of this black hole. It is located 8.57 billion light years away from us. It is so massive that its diameter is 590.5 billion kilometers. A black hole increases in size infinitely as time goes on. Phoneix - A is a large Ultra massive black hole. So it can be concluded that this black hole might be formed at the time of Bigtank.

Time Travel :

Can we do time travel? It we can do how many years is the limit? How much will it take? etc Questions comes in my head. So I started a research about that. I found that according to Eingstein's law of Special Relativity. If any particle travels faster than light then it can see the past. More clearly, we know that we see because of light. As the light takes 8 mins to reach earth so we see the Sun 8 mins late. If the Sun now blasts then we will see the blast 8 mins later. So let you are in a plannet 2023 light years away from earth you put a telescope there and you see that the birth of Jesus Christ. If you are 4 billion light years away then you can see the earth's formation.

Conclusion :

There are lots of wonders in this universe unknown it can be beautiful or ugly. So exploration is not so bad.

"মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার বেশি অধর্ম আর নেই।

— রামমোহন রায়

Tips for My Beloved Students

Pradip Kumar Sarkar

Ex-student & Assistant Teacher

How to score good in English in Madhyamik Pariksha :"

1. There are three skills in Madhyamik English - Reading Skill, Grammar and Vocabulary and Writing Skill. Importance should be laid on each skill separately." 2. For Reading Skill textbooks (four prose pieces and four poems), newspaper, English magazine should be read. This will develop reading comprehension, English vocabulary and writing skill also." 3. In case of grammar particular topics should be constantly practised. Regular practice for vocabulary / finding words must be made from unseen passages." 4. Regular practice for Writing Skill namely letter,paragraph, notice,report, story,biography and processing is essential." 5. Practice from previous years' question papers may be helpful." 6. There is nothing to memorize in Madhyamik syllabus.Success greatly depends on regular practice and correction. So mock test may be fruitful." 7. Hand writing must be legible. " 8. Special emphasis should be laid on the proper form of the phrasal verbs." 9. Exercises incorporated at the end of the text lessons may be taken as the model. "10. Revision of the answerscript at least two times must be done to avoid spelling mistakes and grammatical errors.

"How to score good in English in HS Examination :"

1. There are four prose pieces, four poems and a play in HS syllabus. These should be minutely read. It should be remembered that it would help a lot to score full marks in case of MCQ, SAQ and grammar." 2. The titles of the prose, poem and play along with the names of writers, poets and playwright must be remembered accurately." 3. It is essential to know the meaning and parts of speech of special words in prose, poem and play. It will facilitate to score well in MCQ,SAQ and grammar ." 4. Answer should be written separately for the parts of the question. The context should be mentioned in case of the first part of the question." 5. For Reading Unseen Comprehension emphasis should be laid on regular practice. There is no fear. You can score full marks if you read and answer patiently." 6. For writing skill constant practice should be made. Title for the report is a must. In case of letter, write it following the particular format. In case of precis title is essential. A part of mark is fixed for it." 7. Answer MCQ and SAQ carefully. In case of MCQ you can use pencil first for marking and then use pen while writing the answer ." 8. Complete sentence must be used to answer SAQ. Otherwise mark will be deducted. If there is a spelling mistake in case of the answer- word, no credit will be given." 9. Total answerscript must be revised at least two times." 10. In case of comprehension read the text at least twice/thrice to assimilate the theme. Then read the questions and try to answer. So it will be possible for you to answer them correctly

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিপুল রঞ্জন সরকার
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

সে প্রায় পৌনে দু'শো বৎসর আগের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) থেকে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী এক বাঙালি যুবক কলকাতায় বন্ধুকে লিখছেন ঃ 'আমার কার্যপ্রণালী এইরূপ ঃ ৬টা হইতে ৮টা পর্যন্ত হিব্রু ; ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত স্কুলে অধ্যাপনা; ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত গ্রীক; ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত তেলেগু ও সংস্কৃত; ৫টা হইতে ৭টা পর্যন্ত লাটিন, এবং ৭টার পর হইতে ১০টা পর্যন্ত ইংরাজি। ইহার পরও কি তুমি বলিবে যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে অলংকৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না?' এই যুবকই যখন কলকাতা বিশপস্ কলেজের ছাত্র তখনই ইংরেজি তাঁর কাছে মাতৃভাষার মত; লাটিন ও গ্রীক দু'টো ভাষায় প্রভূত জ্ঞান; ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ইতালিয়ান ভাষায় অক্লেশে কথাবার্তা বলতে পারেন। ফ্রেঞ্চ এবং ইতালিতে এতটা দখল যে কবিতা পর্যন্ত লিখতে পারেন। সব মিলিয়ে কলেজ ছাড়ার আগেই ১২টি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ভাষা শেখায় এই গভীর আগ্রহের কারণ, ঐসব ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ কাব্য-কবিতা ও সাহিত্য মূল ভাষায় পড়ে রসাস্বাদন। এই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী মানুষটি আর কেউ নন, স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের বয়স সহস্রাধিক বৎসর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সহ আরও অসাধারণ প্রতিভাধর কবি ও লেখক মাতৃভাষায় লিখে সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধ নয়, বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন। কিন্তু মধুসূদন ছাড়া আর কোন কবি বা সাহিত্যিক অন্য ভাষার মৌলিক রচনা পাঠের জন্য এই অসাধ্যসাধন করেননি। অনেকেই একাধিক ভাষা শেখেন এবং সেইসব ভাষায় মূল রচনা পাঠ করেন। কিন্তু কখনও তা ১২টি ভাষায় পৌঁছায়নি। মনে রাখতে হবে, মধুসূদন কিন্তু ভাষাবিদ্ নন অর্থাৎ ভাষা শেখার জন্য ভাষা শেখেননি, শিখেছেন সাহিত্যপাঠের জন্য। অথচ ভাষাবিদের তক্‌মা পান। ঊনিশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মনোমোহন ঘোষ বলেন, 'মধুসূদনের সমকালবর্তীদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় বহু ভাষাবিদ ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।'

এই অমিত শক্তিধর মহাকবির জীবনে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলে বোঝা যাবে, শৈশবেই তাঁর মধ্যে সম্ভাবনার বীজ উপ্ত। শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বর্ণশিক্ষার দিনেই সমস্ত বর্ণমালা আয়ত্ত করে ফেলেন। ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত মনীষী, বিজ্ঞান সচেতন অক্ষয়কুমার দত্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় জানতে চান, পৃথিবী কত বড় এবং তার পরিমাপ করা যায় কিনা। মধুও শৈশব থেকে আচার-আচরণে এমন কিছু স্বাক্ষর রাখেন যাতে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিবার-পরিজন অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে উঠেন। তিনি ক্লাসে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন, তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয়। ধনী পরিবারে জন্ম হওয়ায় সবার স্নেহ-মমতা অঝোরে তাঁর উপর বর্ষিত হয়। তিনি স্নান করতে গেলে ৫/৭ টি উনুনে রান্না বসানো হত, যেটিতে আগে রান্না শেষ হত, সেই খাবার খেয়ে তিনি স্কুলে যেতেন। এতেও যদি কোনো ত্রুটি থাকত, তাহলে তিনি অসেদ্ধ খাবার খেয়ে স্কুলে ছুটতেন।

যশোর (অধুনা ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের একটি জেলা) থেকে আটাশ মাইল দক্ষিণে কপোতাক্ষ নদের তীরে, সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদনের জন্ম।.

জন্ম-তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। পার্কসার্কাসে সমাধিক্ষেত্রে জন্ম-বৎসর রূপে উল্লেখ করা হয় ১৮২৩। কিন্তু জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর স্পষ্ট অভিমত, বাংলার ১২৩০ সালের ১২ মাঘ, শনিবার অর্থাৎ ইংরাজির ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি তাঁর জন্ম। পূর্বপুরুষ খুলনার তালাগ্রামের বাসিন্দা। মধুসূদনের পিতৃদেব রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতার দেওয়ানি আদালতের খ্যাতনামা উকিল। জননী জাহ্নবীদেবী পরম স্নেহময়ী, বুকভরা স্নেহ, মধু-অন্ত প্রাণ। তিনি সে যুগে রামায়ণ, মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চন্ডী সযত্নে পাঠ করতেন। স্মরণশক্তি প্রখর। শৈশবে মা সহ বাড়ির অন্যান্য মহিলাদের মধু বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনাতেন। বিশেষ অনুরাগ কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতের প্রতি। জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে, 'মধুসূদনের প্রকৃতিদত্ত কবিশক্তি বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অনুকূলতা করিয়াছিল, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদিগের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ সম্বন্ধে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসে ও কাশীদাসের নিকট মধুসূদন সমধিক ঋণী ছিলেন।' গ্রামের পাঠশালায় একজন শিক্ষক পারসি ভাষা জানতেন। তিনি ঐ ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। মধুসূদন ঐ অল্প বয়সেই অনেক পারসি কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় পারসি গজল গেয়ে বন্ধুদের আনন্দ দিতেন। শৈশবে সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগ। কণ্ঠস্বর মধুর। কেউ গানের সময় কোন কলি ভুলে গেলে তিনি তা পূরণও করে দিতেন।

১২/১৩ বৎসর বয়সে মধুসূদন শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভের জন্য কলকাতায় আসেন এবং ১৮৩৭ সালে তৎকালীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ১৮৪২ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেন। প্রবল অনুরাগ পাশ্চাত্য সাহিত্যে। সেখানে অসাধারণ গুণী বেশ কিছুসংখ্যক অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে তিনি ঋদ্ধ হন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় অধ্যাপক রিচার্ডসনের নাম। রিচার্ডসন ক্লাসে একবার তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনান। মধুসূদনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া - 'আই উইশ আই হ্যভ বিন দ্যা অথর অব ইট' - আহা, আমি যদি এই গ্রন্থটির লেখক হতে পারতাম!' - উক্তিটিতে ধরা পড়ে তিনি কতটা উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করতেন। হিন্দু কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণিতে (অর্থাৎ নবম শ্রেণি, সে যুগে এভাবে চিহ্নিত করণের রেওয়াজ ছিল) পড়ার সময় তিনি কবি-পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর আদর্শ ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি বায়রণ, স্কট এবং মুর। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে মিলটন তাঁর উপাস্য কবি। ইংরেজি কবিতা লিখে সবাইকে উপহার দিতেন। হিন্দু কলেজে যখন তিনি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়েন (১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে), তখনই তিনি বৃত্তিলাভ করেন। তাঁর প্রবল অনুরাগ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে। অধিকাংশ সময় তাতেই ব্যয়িত হয়। গণিতে আগ্রহের অভাব। সহপাঠীদের মধ্যে বিতর্ক - সেক্সপীয়ার ও নিউটনের মধ্যে কে বড়। সহপাঠী এবং পরবর্তী সময়ে বাংলার বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব ভূদেব মুখোপাধ্যায় সহ কেউ কেউ নিউটনকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। মধুসূদনের বিচার উল্টোটি। স্পষ্ট কথা - সেক্সপীয়ার চেষ্টা করলে নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা করলে কখনও সেক্সপীয়ার হতে পারতেন না। বেশ কিছুদিনের ব্যবধান। বিশিষ্ট অঙ্কের অধ্যাপক রিজ সাহেব ক্লাসে একটা অঙ্ক কষতে বলেন। সবাই চুপ। কেউ পারছেন না। মধুসূদন উঠে দাঁড়ান। বোর্ডে অঙ্ক কষতে শুরু করেন। প্রণালীবদ্ধভাবে অঙ্কটি শেষ করেন। সঠিক উত্তর পাওয়া যায়। সবাই হতবাক। মধুসূদন বন্ধু ভূদেবের গা টিপে তিন মাস আগের কথা মনে করিয়ে বলেন, 'কেমন,

সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে যে নিউটন হইতে পারিতেন, তাহা দেখিলে তো!' তখনকার ছাত্রদের চরিত্রের কতগুলি লক্ষণ, যেমন স্বদেশী আচার-ব্যবহার উপেক্ষা, পাশ্চাত্য আচার অনুকরণ, মাত্রাতিরিক্ত নেশা এবং অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি দোষগুলো মধুসূদনকে পেয়ে বসে। যিনি পরবর্তীকালে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচয়িতা, তিনি ছাত্রজীবনে বাংলায় চিঠি লিখতে লজ্জাবোধ করতেন। কেউ মিস্টার সম্বোধন না করলে বিরক্ত হতেন। চেষ্টা করতেন একশো শতাংশ সাহেবি চালচলন রপ্ত করতে। আশঙ্কিত পিতামাতা একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেন। কিন্তু যিনি চালচলনে ইংরেজ, কথায়-বার্তায় ইংরেজ, স্বপ্ন দেখেন ইংরেজিতে, ইংল্যান্ডে যাওয়ার ভাবনায় বিভোর, তিনি গোপনে ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৩ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন। হিন্দু কলেজে হিন্দু বৈ অন্যদের পড়ার অধিকার ছিল না। সম্পর্ক ছিন্ন হয় হিন্দু কলেজের সঙ্গে। ভর্তি হন বিশপস্ কলেজে।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের আগে মধুসূদন দিনকতক খ্রিস্টানদের সহায়তায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ভেতর পালিয়েছিলেন যাতে তাঁর পিতা লোকজন নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে না পারেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেও পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হননি। জননী জাহ্নবীদেবী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে অনেকদিন পর্যন্ত উন্মাদিনীর মতো আচরণ করেন। কিন্তু মধুকে আর ফেরানো সম্ভব হয়নি। অবশ্য পিতা-মাতার আর্থিক সহায়তা থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। বিশপস্ কলেজে চার বৎসরের পাঠ শেষ হলে তিনি পিতা-মাতা ও হিন্দু সমাজের প্রভাব থেকে বহুদূরে ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সামান্য পাথেয় অল্পদিনের মধ্যে শেষ হওয়ায় অচিরেই অর্থ-সংকটের মুখে পড়েন। সেখানে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। দুরবস্থা তাঁকে পেয়ে বসে। কলকাতায় তাঁর মা গোপনে প্রচুর অর্থ জোগান দিতেন। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ সম্বলহীন। মাদ্রাজে খ্রিস্টান ও ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হন। একটি অনাথ ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। প্রাপ্ত সামান্য অর্থে তাঁর চলত না। তিনি সেখানকার প্রধান কয়েকটি সংবাদপত্রে অর্থের বিনিময়ে লেখালিখি শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে সুলেখক এবং পন্ডিত বলে বুদ্ধিজীবী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানেই তিনি প্রথম ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ 'ভিশানস্ অব দ্যা পাস্ট' প্রকাশ করেন। তারপর প্রকাশিত হয় 'ক্যাপটিভ লেডি'। দ্বিতীয় গ্রন্থটি পৃথ্বীরাজের চরিত্র অবলম্বনে রচিত। রাজকুমারী সংযুক্তাকে পৃথ্বীরাজের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাজা জয়চন্দ্র তাঁকে দ্বীপের মধ্যে একটা গিরিদুর্গে আটকে রাখেন। পৃথ্বীরাজ ভাটের ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজকুমারীকে হরণ করেন। মুসলমানেরা পৃথ্বীরাজের রাজধানী অবরোধ করলে তিনি তাদের হাতে পরাজিত হন। অতঃপর অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন।

অল্প কিছুকালের মধ্যেই মধুসূদন স্কচ্ বংশজাত নীলকর সহেবের কন্যা রেবেকা ম্যাকটাভিসকে বিয়ে করেন। কিন্তু এই বিবাহ-বন্ধন স্থায়ী হয়নি। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। মাদ্রাজে থাকাকালীন তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের জনৈক শিক্ষকের কন্যা হেনরিয়েটাকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা একে অপরের পরম নির্ভরযোগ্য সঙ্গী রূপে ছিলেন।

দু'টি ইংরেজি কাব্য মাদ্রাজে সমাদর লাভ করলেও কলকাতায় বিভিন্ন মহলের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। মধু স্বপ্ন দেখেন, ইংরেজি কাব্যচর্চা করে মিলটনের মতো অক্ষয় যশের অধিকারী হবেন। কিন্তু ইংরেজ সমাজ একজন নেটিভ কৃষ্ণাঙ্গকে বিশেষ মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কেউ প্রশংসা করলেও

তেমনভাবে তিনি সমাদৃত হননি। বেথুনসাহেব সহ মধুসূদনের সুহৃদবর্গ তাঁকে পরামর্শ দেন, ইংরেজির পরিবর্তে তিনি মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করুন এবং তাতেই তিনি অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হবেন। ঔপনিবেশিক সেই যুগে মধুসূদন সহ আরও যাঁরা ইংরেজিতে উন্নতমানের কবিতা রচনা করেন, তাঁরা ক্ষেত্রবিশেষে প্রসংশিত হলেও ইংরেজ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে ব্যর্থ হন। অবশ্য, তার প্রায় শতাধিক বৎসর পরে ঔপনিবেশিক পরিবেশ আর নেই। অনেক ভারতীয় ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আর.কে.নারায়ণ, মুলক্‌রাজ আনন্দ, অমৃতা প্রীতম, বিক্রম শেঠ, অরুন্ধতী রায়, ঝুম্পা লাহিড়ী, অরবিন্দ আদিগা, সলমন রুশদি প্রমুখ। বস্তুত এঁদের অনেকেই ইংরেজি সাহিত্যে রাজ করছেন। অথচ সে যুগের মধুসূদন নিঃসংশয়ে কম তো নয়ই, বরং অধিকতর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

মাদ্রাজ থেকে মধুসূদন বাংলায় ফিরে আসেন। কলকাতায় পুলিশকোর্টে সামান্য কাজ পান। এটাই তাঁর জীবিকা। তখন বাংলায় নাট্যশালার আদিযুগ। বেলগাছিয়ায় জমিদারদের উদ্যোগে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে অভিনয়ের উপযোগী নাটকের খুব অভাব । নাট্যশালার অন্যতম উদ্যোক্তা, তথা মধুসূদনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু গৌরদাস বসাক তাঁকে 'রত্নাবলী' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এই কাজটি করে তিনি পাঁচশো টাকা পারিশ্রমিক পান। ৩১ জুলাই, ১৮৫৮ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। গভর্নর সহ কলকাতার বিশিষ্ট সমস্ত মানুষ উপস্থিত। সবাই উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেন। ১২ বার নাটকটি অভিনীত হয়। মধুসূদনের জীবন একটা সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের সন্ধান পায়। একদিন তিনি আক্ষেপ করে বন্ধু গৌরদাসকে বলেন, 'দেখ, কি দুঃখের বিষয়, এই তুচ্ছ একটা নাটকের জন্য রাজারা এত অর্থ ব্যয় করছেন।' বন্ধুবর বলেন ভালো নাটক পাবেন কোথায়? মধুসূদন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। প্রতিশ্রুতি দেন নাটক লিখে দেবেন। কয়েকদিনের মধ্যে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পান্ডুলিপির একটি অংশ গৌরদাস বসাককে দেখতে দেন। মজার বিষয় কয়েকদিন আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষায় তাঁর জ্ঞান লোকের হাসির খোরাক জোগাত। হুগলির নর্ম্যাল স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে পৃথিবী বানান লেখেন 'প্র-থি-বী'। সেই মানুষটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে নাটকটি লিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। ১৮৫৮ -র গোড়ার দিকে নাটকটি প্রকাশিত হয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয় ৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯। মহাভারতের যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হলেও তিনি পুরোপুরি সে কাহিনী অনুসরণ করেননি। তাঁর লেখা যথেষ্ট প্রশংসা পায়। এতদিন যিনি ইংরেজি ভাষার সুপন্ডিত বলে বিবেচিত, তিনি শর্মিষ্ঠা রচনার পর বাংলার সুলেখক রূপে মর্যাদা লাভ করেন। অতঃপর রচনা করেন প্রহসন - 'একেই কি বলে সভ্যতা!' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো'। রচনা করেন 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। পাশাপাশি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেন 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' সহ চতুর্দশপদী কবিতাবলী বা সনেট। প্রতি লাইনে চোদ্দ মাত্রা ও চোদ্দ লাইনের কবিতা। 'সনেট' বাংলাকাব্যে তাঁর হাত ধরেই প্রথম সৃষ্টি হয়।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের রচনা যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালীর মনে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়। তাঁর প্রদর্শিত পথে আরও অনেক শ্রেষ্ঠ কবি বিচরণ করে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। এক আশ্চর্য প্রতিভা। মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের জীবন মহাকাব্যের নায়কের মত। তাঁর যাপন ও সৃষ্টি ঊনবিংশ শতকের বাংলাকে তোলপাড় করে দেয়। তাঁর মৃত্যুর

বহু পরে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। আমরা এখন নোবেল প্রাপকদের যে দৃষ্টিতে দেখি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বা সাহিত্যিক, মধুসূদনের সৃষ্টি নিশ্চিতভাবে ততটা বা তদোধিক গৌরবজনক।

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য'। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। অসাধারণ সেই সৃষ্টি, যার কোনো তুলনা নেই। এই ধরণের মহাকাব্য বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি। নয়টি সর্গে বিভক্ত এই মহাকাব্যে প্রকৃতপক্ষে তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনা বর্ণিত। বিষয়বস্তু চিরপরিচিত। রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র বীরকেশরী মেঘনাদের মৃত্যু প্রতিপাদ্য বিষয়। পুরাতন আধারিত, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি নতুন। এখানে রাক্ষস রামায়ণের 'বীভৎস রসের আধার, নরশোণিতপ্রিয় জীব নহেন বীরত্বে, গৌরবে, ঐশ্বর্য্য এবং শারীরিক সৌন্দর্য্যে সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা মনুষ্য। আচার, ব্যবহারেও আর্য সমাজ হইতে তাঁহাদিগের সমাজের কোন পার্থক্য নাই। আর্য নরনারীগণের ন্যায় তাঁহারাও যজ্ঞ ও দেবপূজা করেন; ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং গঙ্গাজলও তাঁহাদিগের পূজার অঙ্গ। .....রামচন্দ্র ও সীতাদেবী নারায়ণের ও লক্ষ্মীর অবতার নহেন; তাঁহারাও মানব-মানবী এবং পৃথিবীর অপর নরনারীগণের ন্যায় সুখদুঃখভাগী। ..... শেষ কথা এই যে, ইহাতে রামায়ণে অনুল্লিখিত, এমনকি রামায়ণ-বিরোধী অনেক কথাও লক্ষিত হইবে। রামায়ণের ন্যায় ইলিয়াড ও ইনিয়াড প্রভৃতি কাব্যসমূহের অনেক ঘটনা, পরিবর্তিত আকারে, ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণের আদর্শ হইতে ইহার আদর্শও ভিন্ন। মহর্ষি প্রদর্শিত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া কবি ইহাতে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা রাক্ষসপরিবারদিগের প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।' (মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত - যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৪-২৩৫)।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে মধুসূদনের প্রথম রচনা 'তিলোত্তমা' প্রকাশিত হয় মে, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি উপলব্ধি করেন, কাব্যের মধ্যে ভাবের মুক্তি আনতে হলে ছন্দ ও ভাষার মধ্যেও মুক্তি আনতে হবে। মিত্রাক্ষর অর্থাৎ অন্তমিল বিশিষ্ট কবিতাকে তিনি ভাষার বেড়ি বলে মনে করতেন। বিষয়টি বোঝার জন্য একটি উদাহরণ প্রয়োজন। কাশীরাম দাস লেখেন ঃ

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।'

এখানে প্রতিটি লাইনে কবিকে বক্তব্য শেষ করতে হয়, তিনি করতে বাধ্য। এই ধারা পয়ার ছন্দ রূপে পরিচিত। মধুসূদন বোঝেন, এই ধারায় ভাবের মুক্তি ঘটবে না। তিনি চোদ্দ মাত্রার সীমার মধ্যে ছেদ-যতি সহ নানা বৈচিত্র্যের সমাসবদ্ধ ও যুক্ত ব্যঞ্জন বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষা ও ছন্দের এমন একটা গাম্ভীর্য আনেন যাতে সে ভাষা ও ছন্দ বীররসাত্মক মহাকাব্যের উপযুক্ত হয়ে উঠে। বর্ণনার মধ্যে ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য আনার প্রয়োজনে তিনি প্রচুর ধন্যাত্মক শব্দ এবং নাম ধাতু ব্যবহার করেন। প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য শ্রেষ্ঠত্বে উত্তীর্ণ হয় 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্যে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, সাহিত্যে দুই ধরণের মহাকাব্য রয়েছে - সংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারত; গ্রীক ভাষায় হোমারের রচিত ইলিয়াড এবং ওডিসি - এই চারটি জাতীয় মহাকাব্য - এপিক। এর বাইরে ইতালিয় ভাষায় দান্তের 'ডিভাইন কমেডিয়া', লাটিন ভাষায় ভার্জিলের 'ঈনিড', ইংরেজিতে মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' সমগোত্রীয় রচনা। এগুলি সাহিত্যিক মহাকাব্য বা লিটারারি এপিক। ইংরাজিতে বিশ্ববিখ্যাত কবি মিলটন তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট' রচনা করেন ব্ল্যাংক ভার্সে। বাংলায় অমিত্রাক্ষর প্রবহমান পয়ার, প্রতি লাইনে চোদ্দটি

মাত্রা। প্রতি লাইনে ভাবের প্রকাশ সম্পন্ন করার কোন দায় নেই। কবি মাত্রা বজায় রেখে ধারাবাহিকভাবে লাইনের পর লাইনে তাঁর বক্তব্যের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল প্রকাশ ঘটাতে পারেন। এর আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতা পয়ারের শৃঙ্খলে বাধা পড়ে ছিল। মহাদেবের জটাজাল থেকে ভগীরথ যেভাবে গঙ্গাকে মুক্ত করেন, মধুসূদনও প্রায় আটশো বৎসরের পয়ারের বন্ধন থেকে বাংলা কাব্য ও কবিতাকে মুক্তি দেন। তারপর বাংলার কবিকুল ছন্দ নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পান। সেই ধারা আজও অব্যাহত। অমিত্রাক্ষরের নমুনা ঃ

রাক্ষসরাজের পুত্র, বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদা স্বামী রাবণকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেন ঃ

> ''.....তব হৈম সিংহাসন আশে
> যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
> কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
> কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
> নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
> কেহ, ঊর্দ্ধফণাফণী দংশে প্রহারকে।
> কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
> লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
> মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।''

শৈশব থেকে যিনি স্বপ্ন দেখেন, ইংরেজের মতো হবেন, ইংল্যান্ড যাবেন, তাঁকে কি প্রতিরোধ করা যায়? অবশেষে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য জুলাই মাসের শেষে ইংল্যান্ডে যান। ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রবল অর্থকষ্টের শিকার হন। বাংলায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির আয় থেকে, যাঁর নিয়মিত টাকা পাঠানোর কথা, তিনি সুযোগ বুঝে তা বন্ধ করে দেন। স্বদেশে স্ত্রী হেনরিয়েটা সন্তানদের নিয়ে অর্থকষ্ট সহ্য করতে না পেরে প্রবাসে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হন। মধুসূদন আরও বিপাকে পড়েন। যথাসর্বস্ব বিক্রি করে দিনকয়েক চলে। তারপর সব অন্ধকার। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য তিনি যে রৌপ্য পানপাত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট থেকে উপহার পান, তা বন্ধক দিতে বাধ্য হন। মধুসূদন একগুঁয়ে। প্রবাসে কারও কাছ থেকে হাত পেতে দান গ্রহণ করবেন না। অথচ ঘরে অনাহারে স্ত্রী এবং দুই সন্তান। এমন ঘটনাও ঘটে, প্রতিবেশীরা ভোররাত্রে ঘরের সামনে টেবিলে খাবার রেখে যান। হেনরিয়েটা মধুসূদনের অজ্ঞাতসারে ঘরে তুলে নেন। অবশেষে এক দয়ালু ফরাসি রমণীর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি নানাভাবে তাঁদের সাহায্য করতেন। অসহায় মধুসূদন স্মরণাপন্ন হন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন - 'মধুসূদন উপায়ান্তর না দেখিয়া, সেই অশরণের শরণ, 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন।.....আপনার দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া মধুসূদন, এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পত্র লিখিলেন। যে হৃদয়, কোনোদিন, অনাথের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই, মধুসূদনের দুঃখে যে তাহা উদাসীন থাকিবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। মধুসূদনের পত্র পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্বের ও সহৃদয়তার উপযুক্ত কার্য করিলেন। তাঁহার নিজের নিকট সে সময় মধুসূদনের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ছিল না; তিনি ঋণ করিয়া মধুসূদনকে পনেরো শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর আরও কয়েকবার তিনি মধুসূদনকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত ঋণের কিয়দংশ মাত্র পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন; অবশিষ্ট তাহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপরিশোধিত ছিল।''

মাইকেল বিদ্যাসাগরকে প্রথম চিঠিটি লেখেন ২ জুন, ১৮৬৪। দ্বিতীয় চিঠিটি লেখেন ৯ জুন, ১৮৬৪।

তৃতীয় চিঠিটি লেখেন ১৮ জুন, ১৮৬৪। ২৮ আগস্ট, ১৮৬৪, মাইকেল অর্থাভাবে খুবই বিপন্ন। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের মেলায় যাওয়ার আবদার মেটাতে অক্ষম। হাতে মাত্র তিন ফ্রাঁ। তিনি স্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন, ডাকে সুখবর আসবে। তার ঘন্টাখানেক পরে বিদ্যাসাগরের পাঠানো দেড় হাজার টাকা এবং চিঠি হাতে পান। পরিত্রাণ লাভ করেন। এরপরও বিদ্যাসাগর বিভিন্ন সূত্র থেকে ধার করে একবার তিন হাজার টাকা, আর একবার পাঁচ হাজার টাকা মধুসূদনকে পাঠান। তিনি বিদ্যাসাগরের এই সহানুভূতিতে আপ্লুত। তাঁর অন্তরের অনুভূতি উজাড় করে দেন ২ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ তে লেখা একটি চিঠিতে।

ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে পাঁচ বৎসর কাটিয়ে মার্চ, ১৮৬৭ মধুসূদন দেশে ফেরেন। কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেন। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান সহ মেজাজের জন্য আদালতেও বিচারকের সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতেন। কণ্ঠস্বর মদ্যপানের জন্য বিকৃত। রোজগার কমে আসে। সংসার পরিচালনা কঠিন হয়ে উঠে। স্বদেশে ফেরার পর তিনি যে ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন, তখন তেমনভাবে আর সাহিত্যসেবাও করে উঠতে পারেননি। এই পর্বে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি অসম্পূর্ণ - 'নীতিমূলক কবিতামালা', 'হেক্টর বধ' ও 'মায়া কানন'। একদিকে মাত্রাতিরিক্ত নেশা এবং অন্যদিকে অমিতব্যয়িতা ক্রমশঃ পতন ডেকে আনে। প্রচুর ঋণ করেন। যা আয়, তার তুলনায় ব্যয় অনেক বেশি। পরিণতিতে এমন হয়, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করেও ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি। অন্যদিকে তিনি দানশীল। একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মধুসূদনের এক বাল্যবন্ধু পরিচিত কোন ভদ্রলোককে নিয়ে মামলার পরামর্শর জন্য মধুসূদনের কাছে যান। ভদ্রলোক পারিশ্রমিক দিতে চাইলেও নেননি, কারণ তাঁকে নিয়ে এসেছেন বন্ধু। ভদ্রলোক বিদায় নেন। তখন মধুসূদন বন্ধুকে বলেন, তুমি ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এসেছ, তাঁর কাছ থেকে কিছুতেই আমি টাকা নিতে পারি না। কিন্তু আজ আমার ঘরে একটা কানাকড়িও নেই। তোমার সঙ্গে টাকা থাকলে পাঁচটা টাকা আমার স্ত্রীর হাতে দাও। তাহলে আজ খাবার ব্যবস্থা হবে। এই ঘটনায় মধুসূদনের উদারতা প্রকাশ পেলেও, বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। চারদিকে পাওনাদারদের তাগাদা, কিন্তু তিনি নির্বিকার। একদিন তাঁর এক আত্মীয় গিয়ে দেখেন, পাওনাদাররা বাইরে চেঁচামেচি করছে, অন্যদিকে তিনি দোতালায় বসে দান্তের কবিতা পাঠ করছেন। মধুসূদন বোঝেননি এমন নয় যে তাঁর অনুসৃত পন্থা আত্মহত্যার সামিল। পরিণতি সম্পর্কে তিনি যে সচেতন, বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তায় তা প্রকাশও করেন। ক্রমশঃ নানাবিধ রোগের শিকার হন। হার্ট, কিডনি, শ্বাসনালি প্রভৃতি রোগাক্রান্ত, তথাপি মদ্যপানে বিরতি নেই। কার্যোপলক্ষ্যে ঢাকায় গিয়ে ১৮৭৩ -এ যখন কলকাতা ফেরেন তখন তাঁর রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। স্ত্রী হেনরিয়েটাও মৃত্যুশয্যায়। স্বামী-স্ত্রী এবং দু'টি সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য প্রতিদিন পরমুখাপেক্ষী। অনাহার এবং অর্ধাহার নিত্যসঙ্গী। এই অবস্থায় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি মধুসূদনকে পরিবার সহ সেখানে গিয়ে থাকার আমন্ত্রণ জানান। মাস দুই-তিনেক তিনি গঙ্গার তীরে লাইব্রেরিগৃহে বাস করেন। জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুকাল কাটে। কঠিন রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি তাঁর প্রিয় কবি মিল্টন, দান্তে প্রমুখর কবিতা আবৃত্তি করতে ভুলতেন না। বন্ধু গৌরদাস একদিন গিয়ে দেখেন মধুসূদন উপরের ঘরে রক্তবমি করছেন, নীচের ঘরে হেনরিয়েটা। তাঁরও চলার ক্ষমতা নেই। মধুসূদনকে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে

ভর্তি করা হয়। হেনরিয়েটার অচিরেই মৃত্যু হয়। মধুসূদনের স্ত্রীকে শেষবারের মতো দেখার ক্ষমতা নেই। বাড়ির এক পুরনো চাকর খবরটা দেন। চলচ্ছক্তিরহিত মধুসূদনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কাতর স্বরে বলেন, 'ভগবান আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে সমাধিস্থ করলে না কেন?'বন্ধু মনোমোহন বাবু সহ আরও কয়েকজন হেনরিয়েটাকে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করেন। মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করেন , 'সবকিছু ভদ্রোচিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে তো? কোনো ত্রুটি হয়নি তো?' তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করেন, ত্রুটি হয়নি। তখন তিনি বলেন, 'মনোমোহন, তুমি যত্নের সঙ্গে সেক্সপীয়ার পড়েছিলে। ম্যাকবেথের সেই কয়টি লাইন কি তোমার মনে পড়ে?' তিনি জানতে চান - কোন লাইনগুলি? ঐ মুমূর্ষু অবস্থায়ও তিনি বলেন, লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যু সংবাদে ম্যাকবেথ যা বলেন, সেই পংক্তি কয়টি। অতি দুর্বল। তাঁর মধ্যেও তিনি স্পষ্ট আবৃত্তি করেন। ঃ

'To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, candle!
Life's but a walking shadow; a poor player,
That starts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

'কেমন মনোমোহন, ঠিক হয়েছে তো?'

তার পর-ই তিনি ভেঙে পড়েন। বন্ধুদের অনুরোধ করেন, তাঁর সন্তানগুলি যেন অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ না করে। বন্ধুরা তাঁকে আশ্বস্ত করেন। তিনি আর তিনদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। ২৯ জুন, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রবিবার বেলা ২টোয় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেন, 'বাল্যে যাঁহার সেবার জন্য দাসদাসীগণ ব্যাগ্র হইয়া থাকিত, পাছে কোন বিষয়ে তাঁহার পরিচর্যার ত্রুটি হয়, এই চিন্তায় যাঁহার পিতা, মাতা ও আত্মীয়গণ ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন, আজ এই শেষ দিনে তিনি ভিক্ষুক ও অনাথগমে বেষ্টিত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। .....জননীরূপিণী মাতৃভাষার সেবা করিয়া এবং আত্ম-সংযমের অভাবে প্রতিভার পরিণাম কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার আত্মা প্রলোভনময় পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্বক উর্দ্ধলোকে প্রস্থান করিল।'

মানুষ মরণশীল, মধুসূদনেরও মৃত্যু হয়। কিন্তু অমর হয়ে থাকে 'মেঘনাদ বধ' সহ তাঁর মহান সৃষ্টি। ধ্যানে-জ্ঞানে-মননে যিনি একশো শতাংশ কবি, যাঁর সৃষ্টি বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয় সনেট এবং মহাকাব্য, তাঁর কি কখনও মৃত্যু হয়?

**(উদ্ধৃতিতে বানান অপরিবর্তিত আছে)*

'গতি যার নীচ সহ,
নীচে সে দুর্মতি।''

— মধুসূদন দত্ত

''অনেক টাকার মালিক হওয়ার স্বপ্ন না দেখে,
বরং ছোট ছোট সুখের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ুন।
দেখবেন, দুঃখ ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না।''

— মহাত্মা গান্ধী

প্রসঙ্গ ঃ চাকদহ রামলাল একাডেমি

ড. রিপন পাল

প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক

বেলা শেষে বিদ্যালয় পত্রিকায় লিখতে বসে ফিকে হয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলিকে আঁকড়ে ধরি, তারা বারবার সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকুর সঙ্গে মিলিয়ে যায় বলাকা শ্রেণির ডানায় ভর করে পশ্চিমাকাশে। শতাব্দী প্রাচীন, স্বনামধন্য এই বিদ্যালয়ে ১৯৯০ সালে ছাত্রাবস্থায় যা দেখেছি, আজ ৩৩ বছর পর অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে — সবচাইতে বড় পরিবর্তন বিদ্যালয়ের বাইরে — ছাত্রছাত্রীদের হাতে মোবাইল তা প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে উভয় ক্ষেত্রে --- কখনো তারা Whattsapp-এ Facebook-এ Twitter-এ You-Tube-এ আবার কখনোও অনলাইনগেম-এ। সময়ের বেশীটাই তারা এতে ব্যয় করে।

স্বাধীন, সৃষ্টিশীল চিন্তা করার মানসিকতা কমেছে। মানবিকতার জায়গায় যান্ত্রিকতা বাসা বেঁধেছে, চিন্তার বেশীর ভাগটাই মোবাইল — তাই আগের মতো বই পড়ার প্রতি ঝোক নেই — বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে বই নেওয়ার সেই আকর্ষণ আজ আর নেই। বিদ্যালয় পত্রিকায় লেখার শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলতে হলো — না বললেই নয়। একটা সময় ছিল কত লেখা জমা পড়তো কিন্তু তা এখন অনেক কম। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসাবে আমার মনে হয়েছে অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। নিয়মিত অভিভাবক সভার মাধ্যমে আমরা সেই চেষ্টা করে চলেছি। মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমানোর চেষ্টা আমাদের প্রতিনিয়ত করতে হবে। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের এই বিষয়ে অধিকতর সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানাই — কেননা বেশীরভাগ সময় ওরা আপনাদের কাছে থাকে। তাহলে তাদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়বে, স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটবে, সৃষ্টিশীল প্রজেক্ট উপস্থান করতে পারবে, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স-এর মাধ্যমে নিজের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবে, এমনকি খেলাধূলায়, নাচ-গান, আবৃত্তি, ক্যুইজ ইত্যাদিতেও তাদের পারফরমেন্স হবে অউটস্ট্যান্ডিং।

বিদ্যালয়ের দুটি ক্যাম্পাস ঃ

পুরাতন ভবন ও তালতলা ভবন। এখন দুই ভবনে যা হয়েছে, যা আমরা তখন পাইনি — তালতলা ভবনের সুইমিং পুল, পুরাতন ভবনের এই বিশালসৌধ, আই.সি.টি সহ তিনটি কম্পিউটার ল্যাব, স্মার্ট ক্লাস রুম, পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম, সি.সি.টি.ভি ক্যমেরা। সারবেধে মিড-ডে মিল গ্রহণের জন্য ডাইনিং হল, ওয়াটার পিউরি ফায়ার, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক- শিক্ষিকাদের জন্য উন্নত মানের শৌচাগার, সাইকেল গ্যারেজ, বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ ও সৌরবিদ্যুৎ।

ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও (বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির) প্রাক্তন সভাপতি শ্রী অঞ্জয় কুমার শাসমল মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী বিদ্যুৎলতা শাসমল একটি স্মার্ট ক্লাস রুম বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে দান করেছেন। করোনা অতিমারির কারনে তালতলা ভবনে অনেকদিন বন্ধ ছিল বিদ্যালয়ে আকর্ষণীয় সুইমিং পুলটি। বর্তমানে নিয়মিত সাতারের ক্লাস শুরু হয়েছে। দুটি K. Yan-এর মাধ্যমে দুই ক্যাম্পাস-এ পাঠদান চলছে। দুটো ক্যাম্পাসে লাইব্রেরীর সংস্কার সাধন করা সম্ভব হয়েছে এবং

লাইব্রেরী কাম স্টাডিরুম চালু হয়েছে। দুই ক্যাম্পাস-এ ক্লাস রুমগুলিতে গরমের তীব্রতার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু ফ্যান লাগানো হয়েছে। বিদ্যালয়ে দুই ভবনে Class Room ও Teacher's Room দুটিতে পর্যাপ্ত চেয়ার ও টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্য পুরাতন ভবনে একটি কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্র তৈরি হয়েছে।

ছাত্র সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষা ঃ

চাকদহ রামলাল একাডেমী ছাত্রছাত্রীরা সার্বিক সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। ২০২২ সালে উচ্চমাধ্যমিকে বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র, নক্ষত্র দাস ও সৃজা দাস — এদের উভয়ের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৫ (৯৭%)। ২০২৩ সালের সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে দেবেশ সোম, প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৪ (৯৪.৮%)।

২০২২ এর মাধ্যমিকে বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে — মহুল মণ্ডল। মহুলের প্রাপ্ত নম্বর - ৬৭২ (৯৬%)। ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ নম্বর পায় অমিত বিশ্বাস। অমিতের প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৬ (৯৬.৫৭%)।

বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং জগদীশ বোস ন্যাশনাল সাইন্স ট্যালেন্ট সার্চ-এর সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর সাইন্স অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় তিনটি ধাপের পর, রাজ্যস্তরের নবম শ্রেণীর মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে চাকদহ রামলাল একাডেমীর দশম শ্রেণীর ছাত্র, জিষ্ণু দাস, সপ্তম স্থান অর্জন করেছে প্রিয়ম ঘোষ। দশম শ্রেণী মেধা তালিকায় রাজ্যে ৩২-তম স্থানে অমিত বিশ্বাস এবং ৩৬-তম স্থানে সৌরাশিষ মিত্র।

বিদ্যালয়ের ইংলিশ মিডিয়ামের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র উজান দাস, নদীয়া জেলা সমগ্র শিক্ষা অভিযান কর্তৃক আয়োজিত সিট এন্ড ড্র কম্পিটিশনে (গ্রুপ সি বিভাগে) জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। MAKAUT আয়োজিত রাজ্যস্তরের ড্রইং কম্পিটিশনে উজান প্রথম স্থান অধিকার করে।

সর্বভারতীয় স্তরে উল্লেখযোগ্য পারফরমেন্স-এর মধ্যে কয়েকটি ঃ

২০২১-২২ সালে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, গর্ভনমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে রূপঙ্কর মণ্ডলের (দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র) ইন্সপায়ার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি বিদ্যালয়কে গর্বিত করে। অমিত বিশ্বাস (একাদশ শ্রেণী) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স থেকে ছয় সপ্তাহের গণিত সামার প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচিত হয়।

শ্রী অভয় সরকার ৪৯-তম রাজ্য যোগা চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২২ এ প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ইতিপূর্বে অভয় জাতীয় স্তরে স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত ৬৩ তম জাতীয় স্কুল গেমস-এর আণ্ডার ফর্টিন-এ সর্বভারতীয় স্তরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। প্রমিতি বর্মন ইন্ডিয়ান যোগা ফেডারেশন আয়োজিত ৪১-তম জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ-এ (২০২২-২০২৩) প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়া প্রমিতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারতের স্কুল গেমস ফেডারেশনের ৬৬-তম জাতীয় স্কুল যোগাসনা চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট ২০২২-২০২৩ এ রাজ্যের হয়ে অংশ নিয়েছিল এবং যোগাসন ইভেন্টে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আমাদের বিদ্যালয় ও রাজ্যকে গর্বিত করেছে। বিদ্যালয়ের ক্রিকেট ও ফুটবল টিম ব্লক, সাব-ডিভিশন বিভিন্ন স্তরে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া অরিত্র সাধুখাঁ (অনুর্দ্ধ ১৪ বছর) জেলায় ৪০০ মিটার রান-এ প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্য স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ অর্জন করে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য যা করা হয়েছে

রাজ্যব্যাপী গণিত মেলা, বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞান কর্মশালা, কন্যাশ্রী দিবস উদ্‌যাপন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

দিবস উদ্‌যাপন (এদিন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কলারশিপ প্রদান করা হয়), নেচার স্টাডি ও এডভেনচার ক্যাম্প (Organised by District Educaiton Officer, SSM, Nadia), EXPOSURE VISIT-এতে ছাত্র-ছাত্রীদের বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছাত্রদের JBNST-তে জাতীয় স্তরের সায়েন্স কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সফ অলিম্পিয়াডের পরীক্ষায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে, স্কলারশিপ লাভ করে। বিগত দুই বছর যাবৎ National Means Cum Merit Scholarship (NMMSE) পরীক্ষায় উপস্থিতির হার বেড়েছে। ৯ জন করে ছাত্র-ছাত্রী এই স্কলারশিপ পেয়েছে। এই স্কলারশিপ ক্লাস এইট থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত দেওয়া হয় আর্থিক সাহায্য এক হাজার টাকা মাস প্রতি। ছাত্র-ছাত্রীদের কবিতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি সেমিনার করা হয়। এই সেমিনারের উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ কবি Mr. Joe Winter এবং স্বনামধন্য শিক্ষক শ্রী অলোক বিশ্বাস মহাশয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানকে উন্নত করতে সম্মানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা JBNST, IISER, Pune-এ আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন, যার দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রক্রিয়া আধুনিক হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে বিদ্যালয় National Educational Excellence Award-2022 সম্মানে ভূষিত হয়েছে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বহুমুখী প্রতিভার জন্য।

বিদ্যালয়ে জাতীয় সেবা প্রকল্পের কাজ ও কনজিউমার ফোরামের কাজ চলছে। সেবা প্রকল্পের ধারাবাহিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ ০৭/০১/২০২২ তারিখ, জাতীয় সেবা প্রকল্পে রাজ্যের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে চাকদহ রামলাল একাডেমী এবং একই সঙ্গে রাজ্য সেরা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর-এর স্বীকৃতি পেয়েছেন শিক্ষক শ্রী তুষার কান্তি পাল মহাশয়।

শুভানুধ্যায়ী ও প্রাক্তনীদের কাছ থেকে বিগত দু'বছরে যা পেয়েছি ঃ

বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অভ্রদীপ দামের পরিবার থেকে অভ্রদীপ দাম স্মারক বৃত্তি, প্রদত্ত ৫১,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র/ছাত্রীকে এই বৃত্তি দেওয়া হবে।

পুষ্প রাণী বসু স্মারক বৃত্তি, প্রদত্ত ২,৫০,০০০ টাকার প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে পূর্ণমান, হিসাবশাস্ত্রে সর্বোচ্চ এবং বাংলা ও ইংরাজী বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীকে এই বৃত্তি দেওয়া হবে।

অশোক লাহিড়ী স্মারক বৃত্তি — প্রদত্ত অর্থ ২০, ০০০ (কুড়ি হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নবম থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ভূগোল বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীকে এই বৃত্তি দেওয়া হবে।

এছাড়া বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী শ্রী শ্যামল কুমার দাস এবং শ্রী দিলীপ কুমার চ্যার্টাজী, (১৯৬০-এর IAS Officer) তাঁর বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান বই চাকদহ রামলাল একাডেমীর লাইব্রেরীতে দান করেছেন যা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছে।

পরিশেষে বলি চাকদহ রামলাল একাডেমীর ৫৩-তম বর্ষ বিদ্যালয় পত্রিকা "**ক্রেওল**" প্রকাশিত হচ্ছে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে। এই পত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকাসহ শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আর ছোট করবো না। আশা রাখছি, ধারাবাহিকভাবে বিদ্যালয়ের এই পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতি বছরের মতো আগামী বছরও আপনাদের সহযোগিতা পাবো।

জাতীয় সেবা প্রকল্প (NSS) ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে, চাকদহ রামলাল একাডেমি

বহুরূপী সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজেছো ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দের এই মহান মানবিক আদর্শকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছিল '**জাতীয় সেবা প্রকল্প**'। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব-সেবক মহাত্মা গান্ধীর শততম জন্ম দিবসে সরকারিভাবে গড়ে ওঠে **জাতীয় সেবা প্রকল্প বা National Service Scheme (NSS)**

ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (NSS) কী এবং কেন

NSS ভারত-সরকারের একটি জনসেবা মূলক প্রোগ্রাম; যা ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত হয়। NSS নামে জনপ্রিয়, এই স্কিমটি 1969 সালে গান্ধীজির জন্ম শতবর্ষে চালু করা হয়েছিল।

NSS ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের লক্ষ্যে, বিদ্যালয় স্তরের 10+2, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-তরুণীদের ক্যাম্পাস-কমিউনিটি (বিশেষ করে গ্রাম) সংযোগের জন্য কাজ করা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

স্বাধীনতার পর এস. রাধাকৃষ্ণানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবী জাতীয় সেবা প্রকল্প চালু করার সুপারিশ করেছিল। সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজরি বোর্ড অফ এডুকেশন (CABE), 1950-এর জানুয়ারি মাসের বৈঠকে এই বিষয় আবার বিবেচনা করে।

অন্য দেশের অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করে, বোর্ড সুপারিশ করে — "**শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের স্বেচ্ছায় সমাজ উন্নয়নের কাজে সময় দেওয়া উচিত।**" 1958 সালে জওহরলাল নেহেরু, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট একটি চিঠিতে, সমাজ সেবার ধারণাটিকে স্নাতক হওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচনা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সেবা প্রবর্তনের জন্য একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

1969 সালের মে মাসে, শিক্ষা মন্ত্রনালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন একটি সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করেছিল যে, "**জাতীয় পরিষেবা প্রকল্প" রাষ্ট্রীয় ঐক্যের একটি হাতিয়ার হতে পারে।**

ওড়িশায় অবস্থিত বিশ্ব-বিখ্যাত কোনারকের সূর্য মন্দির (দ্য ব্ল্যাক প্যাগোডা) এর বিশাল রথ চক্রের উপর ভিত্তি করে NSS-এর প্রতীক তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতীককে, মুক্তির চক্র হিসেবে চিত্রিত করে, জীবন বিকাশের আন্দোলন ও সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করা হয়েছে। চক্রটিতে লাল রং তারুণ্যের শক্তিকে নির্দেশ করেছে, আর নীল রং মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে মানব কল্যাণের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

জাতীয় সেবা প্রকল্পের লক্ষ্য, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক কল্যাণের ধারণা জাগানো এবং পক্ষপাত ছাড়াই সমাজকে সেবা প্রদান করা। NSS

স্বেচ্ছাসেবকেরা এই মানবিক ইচ্ছাকে সমানে রেখে কাজ করে যে, প্রত্যেক অভাবী মানুষ যেন, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের সহায়তা পান। NSS-এর স্বেচ্ছাসেবীরা গ্রামীণ কর্মঠ সহজ-সরল মানুষদের থেকে জীবনের এই পাঠ লাভ করে যে, সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও মানুষ, কেমন সুস্থ-সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে।

বর্তমানে এদেশের বেশিরভাগ সরকারী এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে NSS ইউনিট রয়েছে। একটি ইউনিটে সাধারণত 20–40 জন শিক্ষার্থী থাকে।

NSS-এর দুই ধরণের কার্যক্রম রয়েছে ঃ

1. নিয়মিত কার্যক্রম (120 ঘন্টা) এবং
2. বার্ষিক বিশেষ ক্যাম্প (120 ঘন্টা)।

সমস্ত NSS স্বেচ্ছাসেবক যারা কমপক্ষে 2 বছর ধরে কাজ করেছে এবং NSS এর অধীনে অন্তত 240 ঘন্টা কাজ করেছে, তারা উপাচার্য এবং প্রোগ্রাম সমন্বয়কের স্বাক্ষরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শংসাপত্র পাওয়ার যোগ্য।

সামাজিক সমস্যা, শিক্ষা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মতো বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে, স্টেজশো বা সচেতনতা র‍্যালি; স্বাস্থ্য শিবিরের জন্য ডাক্তারদের আমন্ত্রণ জানানো — এসবই NSS-এর স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে।

NSS ও চাকদহ রামলাল একাডেমি ঃ

মানব সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ছাত্র-ছাত্রীদের মানবিক ও সেবামূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য চাকদহ রামলাল একাডেমী ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সেবা প্রকল্পের একটি সদস্য ইউনিট হিসেবে কাজ শুরু করে। এই সময়ে জাতীয় সেবা প্রকল্পের প্রথম প্রোগ্রাম অফিসার ছিলেন শিক্ষক কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে চাকদহ রামলাল একাডেমীর NSS ইউনিটের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন শিক্ষক তুষার কান্তি পাল মহাশয়। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে এই সেবা প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে ছাত্র- ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক কাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি স্টেট **NSS অ্যাওয়ার্ড ২০১৮-১৯** — পুরস্কারে পুরস্কৃত হন।

মানব সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে চাকদহ রামলাল একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামগুলিতে সেবা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কর্ম নিয়ে ফিল্ড ওয়ার্ক করেছে। এ প্রসঙ্গে বলতেই হয় চাকদহ শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত যশড়া গ্রামে একটি আদিবাসী পল্লী রয়েছে। চাকদহ রামলাল একাডেমীর NSS ইউনিট এই গ্রামটিকে দত্তক নেয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রকমের সমাজ সচেতনামূলক এবং সেবামূলক কর্মসূচির দ্বারা গ্রামটিকে সাহায্য করা হয়। এবং আধুনিক জীবন যাপনের জন্য প্রান্তবাসী মানুষদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমির NSS ইউনিটের বর্তমান প্রোগ্রাম অফিসার রাজেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে ইউনিটের সেবা প্রকল্পের কাজ সার্থকভাবে পরিচালনা করছেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মহাত্মা গান্ধী ও ভারতবর্ষের অন্যান্য মহান দেশ সেবকদের কার্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী দ্বারা NSS ইউনিটের কার্যাবলী এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমাদের প্রত্যাশা আগামী দিনে চাকদহ রামলাল একাডেমির NSS ইউনিট তাদের কার্যাবলীর দ্বারা ভবিষ্যতের সেবামূলক কাজের নতুন আদর্শ হিসেবে তাদের কাজের স্বাক্ষর রাখবে।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমি ঃ

সমাজসেবা ও মানবসেবার পাশাপাশি চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমির ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রীড়া ক্ষেত্রেও বিশেষ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে।

বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র অভয় সরকার এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী প্রমিতি বর্মন উভয়েই জাতীয় স্তরে যোগ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

যোগা ফেডারেশনের ন্যাশনাল স্তরে প্রমিতি বর্মন প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

জাতীয় স্তরের কাবাডি প্রতিযোগিতায় সন্দীপ পোদ্দার, সুমিত ঘোষ এবং সুমন ঘোষ অংশগ্রহণ করে এবং বিশেষ সফলতা অর্জন করে।

2023 অনুর্ধ্ব 16 বছরের, বালক বিভাগে বিদ্যালয় স্তরের CAB ক্রিকেটে রামলাল একাডেমির ছাত্ররা সেমিফাইনালে অংশগ্রহণ করেছে।

2023 অনুর্ধ্ব 17 বছরের বালক বিভাগে সুব্রত মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্টে চাকদহ রামলাল একাডেমির ছাত্ররা সেমিফাইনাল খেলেছে। কাবাডি অ্যাসোসিয়েশন (চাকদহ জোন) আয়োজিত কাবাডি প্রতিযোগিতায় চাকদহ রামলাল একাডেমির ছাত্ররা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

বর্তমান ক্রীড়া শিক্ষক শ্রী নিশীথ মণ্ডলের সুদক্ষ পরিচালনায় চাকদহ রামলাল একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রীড়া ক্ষেত্রে এভাবেই সফলতা অর্জন করে চলেছে। আমরা আগামী দিনে তাদের এই রকম ধারাবাহিক সফলতা কামনা করি।

চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমির NSS ও ক্রীড়া বিভাগের পক্ষে,
সাধন মণ্ডল
সম্পাদক, স্টাফ কাউন্সিল।

"পশুর মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আমাদের লাভ কী, যদি আমাদের গৌরব করার মতো কিছু না-ই থাকে।"

— কাজী নজরুল ইসলাম

মেঘের রাজ্যে মেঘালয়ে কয়েকদিন

শ্রীজিতা রায়

একাদশ শ্রেণি

আমি আদ্যোপান্ত একজন ভ্রমণপিপাসু বাঙালি। কথায় আছে বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে; যার জন্য কোনো এক জায়গায় তার দীর্ঘদিন মন টেকে না। আমরা হলাম তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে আমরা ২রা ফেব্রুয়ারি বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে আমরা চাকদহ থেকে ব্যান্ডেলে যাই। সেখান থেকে রাতের ট্রেনে গুয়াহাটি পৌঁছাই পরের দিন অর্থাৎ ৩রা ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলা। বহুদিন পর কোনো অচেনা শহরে এসে পড়েছিলাম আমি। অচেনাকে চেনার উদ্দেশ্যেই আমি বেরিয়ে পড়ি, শহর ঘুরে দেখতে। দেখলাম এক টুকরো নিয়ন আলোয় জেগে থাকা অচেনা এক শহর, গুয়াহাটি, হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলাম হোটেলে।

পরের দিন সকালে উঠেই ট্যাক্সি করে রওনা দিলাম মেঘালয়ের রাজধানী শিলং-এর উদ্দেশ্যে। সমতল অতিক্রম করে আমরা যখন পাহাড়ি রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম, তখন পাহাড়ের স্থবিরতা, শান্ত, স্নিগ্ধ রূপে মুগ্ধ হয়ে কেবল চেয়েই ছিলাম। আমার কাছে পাহাড় মানেই এক শান্তির পরশ। নদীর জলের মতো সময়ও খুব দ্রুত অতিক্রম হতে লাগল। আমরা এসে পৌঁছালাম ভারতের সবচেয়ে স্বচ্ছ জলের নদী উমাংগট-এ। বর্ডার থেকে মাত্র ৩০ মিনিট দূরত্বে অবস্থিত। শীতল জলীয়বাষ্প পূর্ণ হাওয়ায় নদী আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। নদীর উপরের ব্রিজ থেকে দেখলাম নদীর তলদেশে থাকা পাথরগুলিকেও স্বচ্ছ ভাবে দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির এই অপরূপ সৃষ্টির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আমরা গেলাম বোরহিল ফলস্ দেখার উদ্দেশ্যে। দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল ঝর্ণার তীব্র শব্দ। কাছে যেতেই শব্দটা আরও সুস্পষ্ট হতে লাগল। যা শুনে কানঝালা-পালা হয়ে যাচ্ছিল। এই জলধারায় শুষ্ক পাহাড়ও শীতলতায় আবেগে ভরপুর হয়ে উঠছিল, সেই সঙ্গে আমরা অনুভব করছিলাম ঝর্ণার এই ভয়ংকর রূপকে।

পরের গন্তব্য, 'মাওলিননং গ্রাম', এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম। গ্রামটিকে দেখে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল এ যেনো কোনো চিত্রকরের হাতে ফুটিয়ে তোলা এক জীবন্ত চিত্র। ঘুরে ঘুরে উপলব্ধি করতে লাগলাম গ্রাম-জীবনের সৌন্দর্যকে। দেখতে পেলাম, প্রতিটি বাড়ির সামনে রয়েছে নানাফুলের গাছ, কোথাও কোনো ধুলো-ময়লা-আবর্জনার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম তারা বিভিন্ন হস্তশিল্পের কাজের সঙ্গে যুক্ত। সন্ধ্যে গড়িয়ে আসতেই তাদের মিষ্টি হাসিগুলোকে বিদায় জানিয়ে আমরা শিলং-এর পুলিশ বাজারের দিকে হাটলাম। ফেরার পথে পড়ল, 'ব্যালেন্সিং রক'-একটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিশাল পাথর, যা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঠিক ছিল সেদিন রাতে শিলং শহর ঘুরে দেখব। যেমন কথা যেমনই কাজ। প্রথমেই ভ্রমণের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হল সেখানের স্থানীয় খাবারের আস্বাদন করা, আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। রাতের খাওয়া সেরে, ফিরে এলাম হোটেলে। রাতে উপভোগ করছিলাম কুয়াশায় ঢাকা শিলং-কে।

সকালের সূর্য পাহাড়কে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেয়, তা দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙল। সেইদিন আমাদের প্ল্যান ছিল আমরা 'লিভিংরুট ব্রিজ' দেখে সোজা যাব চেরাপুঞ্জির দিকে। যাওয়ার পথে প্রথমেই পড়ল 'লিভিংরুট ব্রিজ', দেশের আদিবাসীদের তৈরি করা জীবন্ত এক স্থাপত্য। রবার-ডুমুর গাছের নরম শিকড় দিয়ে তৈরি করা এই সেতু, যা শত শত বছরের পুরোনো বলে মনে করা হয়। ব্রিজটি দেখে একটু আশ্চর্য লেগেছিল।

আমরা চললাম চেরাপুঞ্জির অন্যতম একটি গুহা মোসমাই গুহার উদ্দেশ্যে। গুহাটি বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায়, বেশ প্রাচীন। গুহাটির ভিতরে প্রবেশ করলে গা-ছমছম করে। এক অন্যরকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। পর্যাপ্ত পরিমানে আলো না থাকায় ঠিকমতো বোঝা যায় না, চারিদিকে স্যাঁতস্যাঁতে ও ভেজা এক পরিবেশ, চুনাপাথরের স্তম্ভ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল জল। একটু ভয় ভয়ও করছিল আমার। প্রস্থানের পথ দেখে একটু স্বস্তিবোধ করছিলাম।

ঘুরতে ঘুরতে কখন যে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গিয়ে ৫টা বেজে গেছে টেরই পায়নি। পড়ন্ত বিকেলে আমরা গেলাম 'সেভেন সিস্টার ফলস্' দেখতে। সেখানে একসঙ্গে ৭টি ঝরণা দেখা যায়, যার জন্য এটি ৭টি বোনের সঙ্গে তুলনা করে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। সন্ধ্যে নামার আগে এরূপ প্রকৃতির সৃষ্টিকে দেখতে বড়োই ভালো লাগছিল। সে নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে যেন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, এ এক মনমুগ্ধকর পরিবেশ।

ফিরে আসার সময় হল। তাই কিছুটা বিষণ্ণ মন নিয়েই চেরাপুঞ্জিকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলাম পুলিশ বাজারে। পাহাড়ে এসে কেনাকাটা করব না, তা কি কখনো হয়? তাই সেইদিন কিছু টুকটাক জিনিস কিনে ফিরে গেলাম হোটেলে।

পরের দিন সকালে উঠেই আমরা পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে রওনা দিলাম ঘরে ফেরার পথে। চমৎকার পাহাড়ি পরিবেশ উপভোগ করতে করতে কিছুটা মন খারাপ নিয়ে এসে পৌঁছালাম গুয়াহাটি এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে দমদম, নেতাজী সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

আমার জীবনের যত অস্থিরতা, সব বিরক্তি কিংবা যত বাধা তা সব যেন ভুলে যাই পাহাড়ে গিয়ে। বাড়ি ফিরে এলেও এখনও আমার স্মৃতি জুড়ে বিরাজমান সেই ছবির মতো সাজানো ছোট্টো শিলং শহর। সেই ঝরণা, পাহাড়, লেক, গুহা, লোকসংস্কৃতি যা চিরকাল আমার হৃদয়ে বিরাজমান থাকবে।

"আনুগত্য, দায়িত্ব এবং বলিদান।

— সুভাষ চন্দ্র বসু

কাঞ্চনজঙ্ঘা ও আমি

জিষ্ণু দাস

দশম শ্রেণি

ছেলেবেলা থেকেই আমার চিরদিনের স্বপ্ন ছিল স্বর্ণ আভায় রঞ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। গত বছর শীতকালীন ছুটিতে পরীক্ষা শেষের পর আমার সে সাধ পূর্ণ হলো। হঠাৎ জানতে পারলাম আমার বাবা গোপনে ইতিপূর্বেই দার্জিলিং ভ্রমণের আয়োজন করেছেন।

10 ই ডিসেম্বর আমাদের যাত্রা শুরুর দিন। আগের দিন রাত থেকেই বাড়িতে হইচই পড়ে গিয়েছে। যাত্রীরূপে রয়েছি আমি, মা এবং বাবা। কাকিমা এবং দিদা মালপত্র পোশাক-পরিচ্ছদ গোছাতে মায়ের সাহায্য করছিলেন। পরদিন ভোরে ট্রেন। তখনও সূর্য ওঠেনি। বেরিয়ে পড়লাম স্টেশনের উদ্দেশ্যে। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে উঠলাম। সে গাড়ির নাম কামরূপ এক্সপ্রেস। সাধারণ স্লিপার কোচে আমাদের রিজার্ভেশন টিকিট। মা বাড়ি থেকেই কিছু খাবার রেঁধে এনেছেন। দুপুরে আহার করে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। গাড়ি এগিয়ে চলেছে ''দুরন্ত'' গতিতে। সঙ্গে রয়েছে কিছু ফেরিওয়ালা, বৃহন্নলা আর ঝাঁকুনির প্রতিশব্দ। ধীরে ধীরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এলো। দেখা গেল পূর্ণিমার চাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না।

সময়ের পরোয়া না করে আমি হারিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে। পরদিন ভোরে উঠে মুখ ধুয়ে এসে সিটে বসে দেখি ধীরে ধীরে ক্রমশই আমরা পার্বত্য পরিবেশের সংস্পর্শে এসে পড়ছি। কিছুক্ষণ পরেই এসে পড়লাম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। মনে ভাবি এই বোধ হয় আমার স্বপ্নপূরণের শুভ সূচনা। ট্রেন থেকে নেমে দেখি পার্বত্যঢালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছে জনবসতি। এখনও উচ্চতা দেড়-হাজার পার করেনি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখি চারচাকা মোটর গাড়ির সমাবেশ। প্রত্যেকেই গ্রাহক খুঁজতে ব্যস্ত। শীঘ্রই আমরা বেছে নিলাম একটি উঁচু টাটা সুমো গাড়ি। রাস্তার বন্ধুরতাকে সম্পূর্ণ অমান্য করে মাখনের ন্যায় গাড়ি এগিয়ে চলল। গাড়ির জানালা দিয়ে আগত উচ্চ হাওয়া ক্রমেই শীতলতার আভাস দিতে শুরু করল। কার্শিয়ং পেরিয়ে আমরা পাড়ি দিলাম ভারতের উচ্চতম রেলস্টেশন ঘুম। টয়ট্রেনের অপ্রতুলতা আমাদের গাড়ি আরোহণে বাধ্য করে। ঘুম স্টেশনে নেমে আমরা সকালের প্রাতঃরাশ সেরে কিছু মনোরম দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করলাম। অতঃপর আমরা এয়ি গেলাম শৈলশহর দার্জিলিং-এর উদ্দেশ্যে। নিজের অকপটেই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি শ্বেত তুষারে আবৃত একটি আবছা পর্বত শ্রেণির উঁচু শৃঙ্গ। গাড়ি চালককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এটিই নাকি সেই — যার সম্বন্ধে পড়েছিলাম ভূগোল বইতে, বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা। একটি ভাড়া করা হোটেলে উঠলাম তিন রাত্রির জন্য। প্রথম দিনই ব্রহ্মকালে বেরিয়ে পড়লাম টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখার উদ্দেশ্যে। টাইগার হিলে উঠে আঁধার ঘেরা ভিড়ে হারিয়ে গেলাম। ঠেকনা দিলাম হেলানো ইটের প্রাচীরে। একাধিক শৃঙ্গের মাঝে হঠাৎই আঁধার ঘুচে দেখা গেল রক্তিমের আভা। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল নীচের মেঘরূপী কুয়াশা। দূরে উত্তরে

আকাশমাঝে দেখা গেল মুকুটের ন্যায় রঙিন শৃঙ্গ। দেখলাম সূর্যোদয়ে রঙিন স্বর্ণ আভায় রঞ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘা। সেই আমার প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন।

পুলকিত চিত্তে নেমে এলাম টাইগার হিল থেকে। মা এবং বাবাকে নিজের ভাব বোঝাতে না পেরে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ডায়েরিতে লিখে ফেললাম মনের কথা। তারপর ঘুরে দেখলাম দার্জিলিং-এর অনেক জায়গা। দিন তিনেক পরে ফেরার ট্রেন। দার্জিলিং মেল ধরে ফিরে এলাম শিয়ালদহে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরা। তারপর অবশ্য অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনে হৃদয়ে সৃষ্ট আলোড়ন যেন ক্ষণে ক্ষণেই আমার কিশোর মনকে আন্দোলিত করে তোলে। প্রকৃতির সুদৃশ্যতম স্থান যেন আমার প্রাণকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে দিয়েছে। অবসরই যেন আমার কাটে এখন দ্বিতীয়বার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার আর্ত পিপাসায়। আমি অপেক্ষায় রইলাম ..... তোমার জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা।

Travel to Sikkim

Dishan Kha

Class - V

My name is Dishan Kha, I went to Sikkim with my parents last year in month of December. I was very excited when it was the day of going to Sikkim. We reached Sealdah Station. We were wating for our train Darjelling Mail. When the train had arrived we caught the train. We sat on the train and after sometimes we took our dinner. We went to sleep after dinner. I woke up from sleep and reached NJP station. We reached a hotel and our team was waiting for us. We went to a car! The driver reached us Sikkim . We took our lunch in a road side. First time I saw mountains view. We reached Gangtok in the evening and cheeke in our hotel. After that I went with my father to see the MG Marg. The next day we went to 7 point views of Gangtok. There I ate Momo & Maggi it was very tasty.

Next day we went to Lachung, it took a full day to reach Lachung. The next day we woke up early and went to Zeropoint. I was very excited to see snow-capped mountains. I played with ice. We were lacking of oxygen deficiency. Also there were many waterfalls, we saw a famous waterfall named 'Amitabh Bachchan' and we saw a miracle there where the water was falling there was a rainbow. We came back to Gangtok in the evening. The next morning we left Gangtok and safely reached at home.

CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY

BENGALI & ENGLISH MEDIUM CO-EDUCATIONAL GOVERNMENT SPONSORED HIGH SCHOOL